চোখ ও চশমা

ডা. এম. নজরুল ইসলাম

চোখ ও চশমা

চোখ ও চশমা

ডা. এম. নজরুল ইসলাম
এমবিবিএস, এমসিপিএস (চক্ষু) ডিও এফসিপিএস (চক্ষু)
ফেলো ইন ফ্যাকো সার্জারী (ব্যাংকক)
আন্তর্জাতিক ফেলো ইন গ্লকোমা (আমেরিকা)
সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ
বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

অন্যপ্রকাশ

প্রথম অন্যপ্রকাশ সংস্করণ | একুশের বইমেলা ২০০৮
প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ১৯৯৪

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১২০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Chokh O Chasma | Dr. M. Nazrul Islam
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 120.00 only
ISBN : 984 868 463 8

সুখ দুখ আনন্দ বেদনার সাথী
আমার প্রিয় বান্ধবী
নাজমা ইয়াসমীন স্বপ্না-কে

অন্যপ্রকাশ সংস্করণের ভূমিকা

আমার রচিত *চোখ ও চশমা* বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে কয়েক বছর আগে। আমাদের দেশের অনেক সম্মানিত রোগী আছেন যারা চোখ ও চশমা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চান, যা ডাক্তারের চেম্বারে বা হাসপাতালে স্বল্প সময়ে ব্যাখ্যা দেয়া বা জানানোর সুযোগ হয় না। ইতিমধ্যে চোখের চশমা এবং চশমার পরিবর্তে কিছু আধুনিক চিকিৎসারও সুযোগ হয়েছে। সেই সকল অনুসন্ধিৎসু রোগীদের জন্য এবং পরিবর্তিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে বইটির এই নতুন সংস্করণের প্রয়াস পেয়েছি। যারা চশমা ব্যবহার করেন তাদের অনেকের জন্য কন্টাক্ট লেন্স ছাড়াও, আধুনিক চিকিৎসা, যেমন ল্যাসিক (লেজার) সার্জারির সুযোগ তৈরি হয়েছে। বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে নতুন রোগ 'কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রম'-এর ব্যাপকতা অনেক বেড়েছে।

প্রথম সংস্করণের লেখাগুলোর সঙ্গে এই সংস্করণে 'চশমার পরিবর্তে ল্যাসিক সার্জারি' এবং 'কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রম' এই দু'টি বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ পাঠক পাঠিকার সহজতর বোধগম্যের জন্য অনেক প্রবন্ধে নতুন নতুন ছবি সংযোজন করা হয়েছে।

বইটির এই নতুন সংস্করণ করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন বারডেম হাসপাতাল চক্ষু বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ.কে. আজাদ খান, আমার স্ত্রী ডা. নাজমা ইয়াসমিন এবং আমার তিন সন্তান ইকরাম, সাবা ও নিলয়।

চোখ ও চশমা বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার দায়িত্ব নেয়ায় অন্যপ্রকাশ এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ করে প্রকাশক জনাব মাজহারুল ইসলাম-এর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি সাধারণের উপকারে লাগলে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে মনে করব।

ডা. এম. নজরুল ইসলাম
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

লেখকের কথা

চোখ ও চশমা যেন একটি আর একটির সম্পূরক। আমাদের সকলেরই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে চশমা পরার প্রয়োজন হয়ে থাকে। সম্ভবত এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যেখানে কেউ-ই চশমা ব্যবহার করেন না। পরিবারে ছেলে-মেয়ে, বাবা-মার প্রয়োজন না হলেও দেখা যায় দাদুর ঠিকই চশমা লাগে।

প্রাত্যহিক জীবনের এই সঙ্গী চশমার কাজ হলো প্রয়োজনীয় পাওয়ারের লেন্সের সাহায্যে ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করা। সবাই দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে চান, ভালোভাবে দেখতে চান। কিন্তু তবুও চশমা পরার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেকেই চশমা পরেন না। অথচ সঠিক সময়ে চশমা না পরা প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্বের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে। আবার চশমা পরা নিয়ে নানা সংস্কার আর ধারণা প্রচলিত আছে যার কিছু কিছু একেবারে ভ্রান্ত, এমনকি চোখের জন্য ক্ষতিকর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র সঠিক জ্ঞানের অভাবে চশমার গুরুত্ব উপলব্ধি না করে অনেকেই নিজের অজান্তে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করে থাকেন। আবার চক্ষু চিকিৎসকের কাছ থেকে চশমার ব্যবস্থাপত্র নেবার সময় চোখ ও চশমা সম্পর্কে রোগীর জিজ্ঞাস্য থাকে বহু বিষয়। চিকিৎসক হয়তো এ বিষয়ে তাকে একটি প্রাথমিক ধারণা দেন কিন্তু এসময়ে রোগীর সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সেইসব কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু, সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এই বইটি রচিত হলো। বইটিতে মূলত চশমা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী যারা বাংলাভাষায় এ বিষয়ে জানতে চান তাদেরও এ বইটি কাজে লাগবে বলে আশা করি।

আমার পরম শ্রদ্ধের দুইজন শিক্ষক অধ্যাপক এ কিউ এস এম হারুণ এবং অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে তাঁদের অনেক মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ এবং মতামত দিয়েছেন। তার জন্য তাঁদের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ এম এ মান্নান তালুকদার এবং আমার সহকর্মী এই হাসপাতালের অন্যান্য চক্ষু বিশেষজ্ঞের কথা যাদের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে বইটি রচনা সহজতর হয়েছে।

আমার স্ত্রী ডাঃ নাজমা ইসলামের সার্বক্ষণিক উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণাতে আমার এই বই লেখা ও প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। এই বই লিখতে গিয়ে তাঁর ও আমার ছোট্ট তিন ছেলে-মেয়ে নিলয়, সাবা এবং ইকরাম-এর যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা সার্থক হবে যদি বইটি কারো উপকারে লাগে।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় চশমা সংক্রান্ত এটাই প্রথম বই। আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ বইয়ে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। আশা করি সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ বইয়ের গঠনমূলক সমালোচনা এবং যে-কোনো মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

এম. নজরুল ইসলাম
জানুয়ারি, ১৯৯৪

সূচি

চোখ ১৩
আমরা কিভাবে দেখি ১৭
চশমা, চশমার ইতিহাস ২০
চশমার প্রয়োজনীয়তা ২১
চশমার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ২২
কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা ২৫
চোখের রিফ্র্যাকশন বা প্রতিসরণ ২৯
স্বাভাবিক রিফ্র্যাকশন বা ইমেট্রোপিয়া ৩১
হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূর-দৃষ্টি ৩২
মায়োপিয়া বা নিকট-দৃষ্টি ৩৫
অ্যাসটিগম্যাটিজম ৩৯
চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া ৪২
বাইফোকাল চশমা ৪৫
ট্রাইফোকাল চশমা ৫২
মাল্টিফোকাল চশমা ৫৪
ছানি অপারেশনের পরবর্তী চশমা ৫৬
রোদ-চশমা বা সানগ্লাস ৫৮
ফটোক্রমিক গ্লাস ৫৯
রাতে গাড়ি চালাবার চশমা ৬০
আয়না চশনা ৬০
চশমার পরিবর্তে ল্যাসিক সার্জারী ৬১
চশমা ও গ্লাসের যত্ন ৬৪
কন্টাক্ট লেন্স ৬৫
চশমার কাচ ৬৮
চশমার ফ্রেম ৭১
চশমায় অ্যালার্জি ও চর্মপ্রদাহ ৭৫
চশমার সাহায্যে অন্ধত্ব প্রতিরোধ ৭৬
কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম ৭৭

চোখ

চোখ দিয়ে আমরা দেখি। কেউ কেউ চশমার সাহায্য নিয়ে দেখেন। দেখার ক্ষেত্রে চোখ এবং চশমার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সেজন্য শুরুতেই যদি চোখ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা থাকে তাহলে চোখ আমাদের কীভাবে দেখতে সাহায্য করে এবং এক্ষেত্রে চশমারই বা ভূমিকা কী সেটা পরবর্তীকালে বুঝতে সুবিধা হবে। তাই এখানে খুব সংক্ষেপে সহজ ভাষায় চোখের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

আমাদের মাথার খুলির সামনের দিকে দুটি চক্ষু কোটরের মধ্যে গোলাকার দুটি চোখ (Eyeball) থাকে। চোখের দুটো পাতার মধ্যে চোখকে আয়তাকার দেখালেও চোখ আসলে গোলাকার। আর এই অক্ষিগোলকের বাইরের আবরণ তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি এবং ভেতরে রয়েছে চোখের জলীয় পদার্থ যেমন অ্যাকুয়াস, ভিট্রিয়াস এবং লেন্স ইত্যাদি।

অক্ষিগোলকের বাইরের স্তর

এই স্তরটি শক্ত, মোটা ও তন্তুজাত বা ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে তৈরি। এর সামনের ১/৬ অংশ দেখতে স্বচ্ছ ও একটু উত্তল। যাকে কর্নিয়া বলা হয়। এই স্তরের পেছনের ৫/৬ অংশ অর্থাৎ কর্নিয়া বাদে বাকি অংশ বেশ পুরু, সাদা এবং অস্বচ্ছ— যার নাম স্ক্লেরা।

কর্নিয়া দেখতে ঘড়ির কাচের মতো স্বচ্ছ। এর পেছনে আইরিস থাকে বিধায় সাধারণভাবে একে কালো মনে হয়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। কর্নিয়ার ভেতর দিয়ে আলো চোখে প্রবেশ করে এবং আমরা দেখতে পাই। কর্নিয়ার ব্যাস (diameter) চোখের ভেতর থেকে ১১ মিলিমিটার, কিন্তু বাইরে থেকে কর্নিয়ার পাশাপাশি ব্যাস ১২ মিলিমিটার এবং উপর-নিচ ব্যাস ১১ মিলিমিটার। সেজন্য কর্নিয়া পুরোপুরি গোলাকার নয়, বরং উপবৃত্তাকার (eliptical)। কর্নিয়ার এই স্বাভাবিক আকৃতির (curvature) পরিবর্তন হলে চোখের পাওয়ারের পরিবর্তন হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চোখে প্রয়োজনীয় সিলিন্ডার লেন্স ব্যবহার করলে ভালো দেখা সম্ভব হয়। কর্নিয়াতে কোনো রক্তনালি নেই, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্নায়ু (Nerve) রয়েছে, তাই এটি খুব সংবেদনশীল।

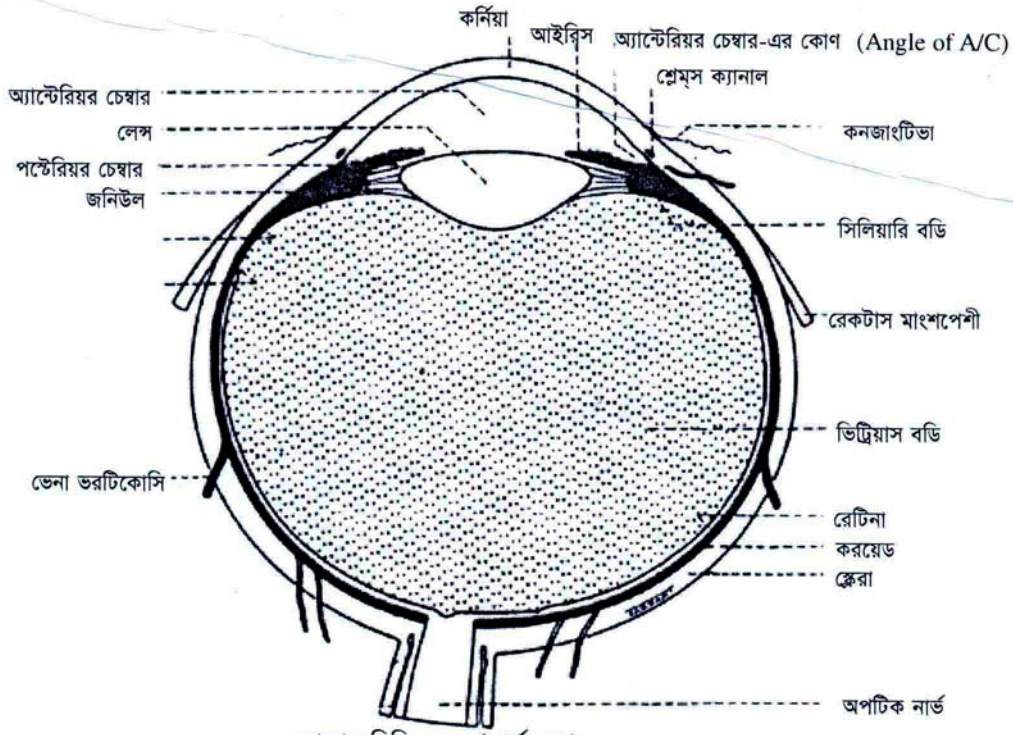

চোখের বিভিন্ন স্তর (পার্শ্বচ্ছেদ)

স্ক্লেরা এবং চোখের পাতার ভেতরের দিক একটি পাতলা পর্দায় ঢাকা থাকে যার নাম কনজাংকটিভা (নেত্রবর্ত্ম)। এই পর্দায় অনেক সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালি আছে। স্ক্লেরার গায়েই রেকটাস মাংশপেশিগুলি লাগানো থাকে যাতে চোখ বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়। স্ক্লেরার পেছন দিয়ে অপটিক নার্ভ বা অক্ষি স্নায়ু বের হয়। এছাড়া ৪টি বড় শিরা (ভেনাভরটিকোসি) চোখের ভেতর থেকে স্ক্লেরার ভেতর দিয়ে বাইরে বের হয়। অপটিক নার্ভের চতুর্দিক দিয়ে ছোট ও বড় সিলিয়ারি ধমনি চোখের মধ্যে প্রবেশ করে।

অক্ষিগোলকের মধ্যস্তর

বাইরের স্তর, কর্নিয়া-স্ক্লেরা এবং ভেতরের স্তর, রেটিনার মাঝখানে থাকে মধ্যস্তর- ইউভিয়াল ট্রাক্ট (Uveal tract)। ইউভিয়াল ট্রাক্ট এর তিনটি অংশ— ১. কোরয়েড, ২. সিলিয়ারি বডি, ৩. আইরিস।

সবচেয়ে বড় ও পেছনের চকলেট রঙের রক্তনালিতে ভরা অংশের নাম কোরয়েড। সিলিয়ারি বডি প্রায় ৬ মিলিমিটার লম্বা। এর মধ্যে যে মাংশপেশি আছে তার নাম সিলিয়ারি মাংশপেশি। এ মাংশপেশিতে তিন ধরনের আঁশ বা ফাইবার রয়েছে। যেমন— ক. লম্বালম্বি আঁশ। (longitudinal fibre), খ. রেডিয়াল অবলিক বা বাঁকা আঁশ (Radial oblique fibre), গ. বৃত্তাকার আঁশ (circular fibre)। আমাদের চোখে দেখার জন্য এই সিলিয়ারি পেশি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। দূরে দেখার জন্য এই পেশিগুলির শিথিলতা (relaxation) হয় ও লেন্সের পাওয়ার তুলনামূলক কম থাকে। অন্যদিকে কাছে দেখার জন্য এই মাংশপেশির সংকোচন (contraction) হলে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট ঢিলা হয়ে যায়, ফলে লেন্সের আকৃতির পরিবর্তন হয়ে সামনে পিছনের পুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ও পাওয়ার বেড়ে যায়। এর ফলে আমরা দেখতে পাই। এই পদ্ধতির নাম অ্যাকোমোডেশন (Accommodation)। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিলিয়ারি পেশি সংকোচনের ক্ষমতা কমে যায়, যার ফলে লেন্সের পাওয়ার প্রয়োজনের তুলনায় প্রাকৃতিক নিয়মে বাড়ানো যায় না অর্থাৎ অ্যাকোমোডেশন কমে যায়। চল্লিশোর্ধ বয়সে এই ধরনের অবস্থা হয়ে থাকে যাকে চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া (Presbyopia) বলে। এক্ষেত্রে তাই তাদের কাছের জিনিস পড়তে একটু অসুবিধা হয়। তাদেরকে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পাওয়ারের চশমা দিলে তারা ভালো দেখে থাকেন।

বয়সভেদে সিলিয়ারি মাংশপেশি সংকোচন করে অ্যাকোমোডেশন-এর মাধ্যমে লেন্সের পাওয়ার বাড়াবার ক্ষমতার ভিন্নতা হয়ে থাকে। ছোট শিশুরা কাছে তাকাবার সময় চোখের লেন্সের পাওয়ার অনেক বাড়াতে পারে। আর এই কারণেই ছোট শিশুদের চোখ পরীক্ষা করতে হলে এট্রপিন ড্রপ বা মলম দিয়ে এই অ্যাকোমোডেশন পাওয়ারকে ক্ষণস্থায়ীভাবে নষ্ট করে পরীক্ষা করতে হয়।

ইউভিয়াল ট্রাকট এর সবচেয়ে সামনের অংশটুকুকে আইরিস বলে। গোলাকৃতির আইরিসকেই সাধারণ মানুষ চোখের মণি বলে থাকেন। আর এর মাঝখানে যে ছোট ছিদ্র সেটাই হচ্ছে চোখের তারা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় পিউপিল বা অক্ষিতারা। জাতি ও বর্ণ অনুযায়ী এই আইরিসের রঙের ভিন্নতা (কালো, নীল, বাদামি ইত্যাদি) হয়ে থাকে। আইরিস একটি পর্দার মতো কর্নিয়া ও লেন্সের মধ্যের স্থানকে দুভাগে ভাগ করেছে। সামনের অংশটির নাম অ্যান্টেরিয়র চেম্বার আর পেছনের অংশের নাম পস্টেরিয়র চেম্বার। পস্টেরিয়র চেম্বারে চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হয় ও পিউপিলের মধ্য দিয়ে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে প্রবেশ করে। এবং এই চেম্বারের কোণ দিয়ে চোখের বাইরে রক্তে মিশে যায়।

অক্ষিতারা বা পিউপিল উজ্জ্বল আলোতে ছোট ও কম আলোতে বড় হয়ে চোখের মধ্যে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাছে দেখার সময় পিউপিল ছোট হয়ে ভালো দেখতে সাহায্য করে।

অক্ষিগোলকের ভেতরের স্তর

সবচেয়ে ভেতরের স্তরের নাম অক্ষিপট বা রেটিনা। এটাকে নার্ভাস স্তর বলে কারণ এই স্তরেই চোখে প্রবেশকৃত আলোকে ধারণ করবার মতো স্নায়ুকোষ রয়েছে। রেটিনার কেন্দ্রস্থলে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল স্থানকে বলে ফোভিয়া। এবং এর আলো ধারণক্ষমতা সবচেয়ে বেশি বিধায় আমরা এই স্থানের সাহায্যে সবচেয়ে নিখুঁত দেখতে পাই। এই জন্যই আমরা সামনের দৃশ্য যত স্পষ্ট দেখি, পাশেরটা ততো স্পষ্ট দেখি না। রেটিনায় আলো পড়লে তা বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছে এবং আমরা দেখতে পাই।

লেন্স (Lens)

অক্ষিগোলকের আইরিস ও ভিট্রিয়াসের মাঝখানে একটি উভয়োত্তল (biconvex) লেন্স আছে। ভিট্রিয়াস বডির সামনের দিকে একটি খাদ আছে সেখানে লেন্সটি থাকে। এছাড়া সিলিয়ারি বডির সাসপেনসারি লিগামেন্ট দিয়েও এটা ঝুলানো থাকে। লেন্সের সামনে ও পেছনে দুটি পৃষ্ঠ বা তল (surface) আছে। নিকট দৃষ্টির বেলায় সামনের তল আরো বেশি উত্তল হয়ে অ্যাকোমোডেশন-এর মাধ্যমে লেন্সের পাওয়ার বাড়াতে পারে। লেন্সের কাজ হচ্ছে আলোকে ফোকাস করে রেটিনায় স্পষ্ট ছবি তৈরি করা।

ভিট্রিয়াস বডি

স্বচ্ছ জেলির মতো আঠালো ভিট্রিয়াস অক্ষিগোলকের $^{৪}/_{৫}$ ভাগ জুড়ে থেকে চোখের আকার ও স্থিরতা বজায় রাখে। ভিট্রিয়াস বডি লেন্সের পেছন থেকে আরম্ভ করে রেটিনার অপটিক ডিস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা কিভাবে দেখি

আমাদের চারপাশের যা কিছুকেই আমরা দেখি তা আসলে ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করবার জন্য। চোখ বন্ধ করলে বা অন্ধকারে সেই জন্য আমরা দেখতে পাই না। কোনো বস্তু থেকে আলো চোখে পড়লে তা চোখের প্রতিসরণক্ষম মাধ্যম (Refractive Media) যেমন কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স এবং ভিট্রিয়াস এর মধ্য দিয়ে রেটিনাতে পৌছে। এ সকল প্রতিসরণক্ষম মাধ্যম বিশেষত লেন্সের কাজ হচ্ছে আগত আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে ফোকাস করা। স্বাভাবিক চোখে কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে পড়ে ও স্বাভাবিক দেখা যায়। যাদের চোখের ঐ প্রতিসরণক্ষম কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণ ক্ষমতা কম বা বেশি থাকে তাদের চোখে আলোকরশ্মি রেটিনার যথাক্রমে পেছনে বা সামনে পতিত হয়। এসব ক্ষেত্রে চোখের সামনে প্রয়োজনীয় পাওয়ারের চশমা দেয়া হলে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে পতিত হয়ে ভালো দেখতে সাহায্য করে।

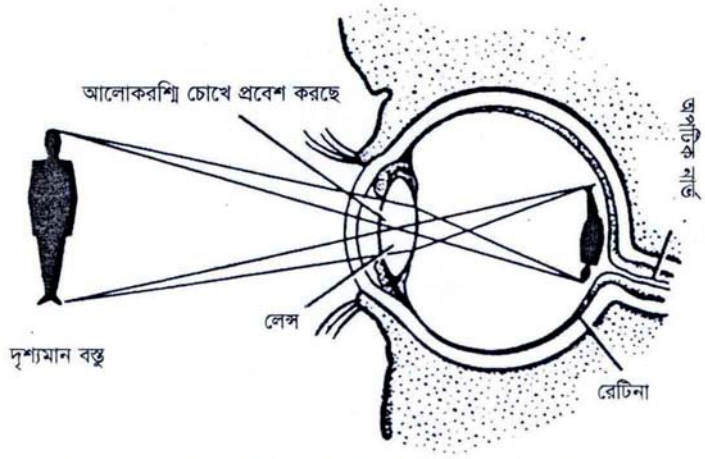

ছবিতে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় উল্টো আকারে পতিত হয়েছে

খালি চোখে কিংবা চশমা দিয়ে দেখার সময় কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মি লেন্সের মাধ্যমে রেটিনাতে উল্টো আকারে পতিত হয়। যেমন একজন দাঁড়ানো মানুষের ছবি রেটিনাতে এমনভাবে পড়ে যে তার মাথা নিচের দিকে ও পা ওপরের দিকে থাকে। আলোকরশ্মি রেটিনাতে পতিত হবার পর সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয়ে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয় এবং অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) দিয়ে এই উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌছে। মস্তিষ্কের দৃষ্টির কেন্দ্রে পৌছার পর আমরা উল্টো বস্তুকে সোজাভাবে দেখতে পাই। যেমন একজন দাঁড়ানো মানুষকে দাঁড়ানোই দেখতে পাই।

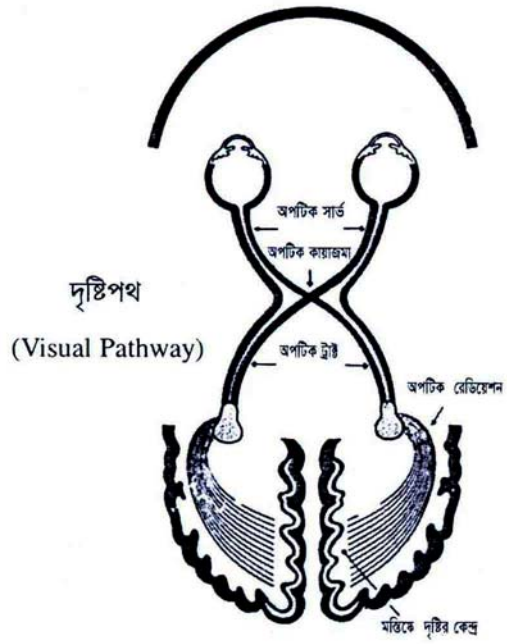

রেটিনা থেকে স্নায়ুবিক উত্তেজনা অপটিক নার্ভ, অপটিক কায়াজমা, অপটিক ট্রাক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে মস্তিষ্কের দৃষ্টির কেন্দ্রে পৌছে

প্রতিসরণক্ষম মাধ্যম বিশেষত কর্নিয়া ও লেন্সের কোনো ত্রুটি থাকলে তা সাধারণত চশমার সাহায্যে ঠিক করে ভালো দেখা যায়। চশমা সম্পর্কে আলোচনার আগে চোখের প্রতিসরণ ও এর ত্রুটি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সাইড পিস বা টেম্পল
রিম
ব্রিজ
জয়েন্ট

চশমা, চশমার ইতিহাস

চোখের দৃষ্টি বাড়াবার জন্য কিংবা চোখের প্রতিসরণ ত্রুটি (Refractive error) ঠিক করার জন্য একটি ফ্রেমে কাচ বা প্লাস্টিকের লেন্স ব্যবহার করে চোখের সামনে পরা হয়। এই লেন্স ও ফ্রেমের সমন্বয়কেই চশমা বলা হয়।

চশমার ইতিহাস

কবে কোথায় প্রথম চশমার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, প্রাচীন সভ্যতার যুগ থেকেই চশমার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। মনে করা হয় চীনে সর্বপ্রথম চশমা বা লেন্সের ব্যবহার হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ২২৮৩ সালে একজন চীনা সম্রাট তারা দেখার জন্য সর্বপ্রথম লেন্স ব্যবহার করেছিলেন। মার্কো পোলোর একটি চিঠিতে জানা যায়, তিনি ১২৭০ সালে যখন চীনে কুবলাই খান কোর্ট দেখতে যান, তিনি দেখেছিলেন সেখানকার বয়স্করা ছোট লেখা পড়বার জন্য উত্তল লেন্স (Convex lens) ব্যবহার করতেন।

প্রথম দিকে চশমা সাধারণত নাকের ওপরই পরা হতো। একে সুতা বা তার দিয়ে আটকিয়ে কানের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো। তখনকার দিনে বড় বড় ধর্মানুরাগী সন্ন্যাসী, উচ্চ শিক্ষিত বিত্তবানরাই চশমার ব্যবহার করতেন। সোনা বা রুপা দিয়ে তৈরি করা হতো চশমার ফ্রেম। অবশ্য উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্য কচ্ছপের খোলসের তৈরি চশমার ফ্রেম ছিল বেশ জনপ্রিয়। বর্তমান যুগের মতো উন্নত চশমার কাচ বা লেন্স প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হতো না। প্রথম দিকে বিভিন্ন ক্রিস্টাল, কোয়ার্টজ, বেরিল ও পাথর দিয়ে লেন্স তৈরি করা হতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথম কাচের লেন্স তৈরি হয় ইতালির ভেনিস শহরে। প্রায় এক শতকের পরীক্ষা ও গবেষণার পর তৈরি হয়েছে বর্তমানে ব্যবহৃত চশমার কাচ (Optical glass)। প্রাচীনকালে চশমা পাওয়া যেত শুধু প্রস্তুতকারকদের কাছে। ক্রেতাগণ জামাকাপড় কেনার মতোই বিভিন্ন পাওয়ারের লেন্সের মধ্য থেকে তার প্রয়োজনীয় চশমাটি কিনে আনতেন।

চশমার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম বিশেষ করে লেখাপড়া ও অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজের জন্য ভালো দৃষ্টিশক্তি থাকা অত্যাবশ্যক। ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি থাকলে শিশুদের লেখাপড়ায় উন্নতি করা সম্ভব হয় না, বড়দের নিজ নিজ পেশার কাজেও অগ্রগতি সাধিত হয় না। শিল্প ও কলকারখানার শ্রমিকদের কাজের গতি কমে যায়, সর্বোপরি রাস্তায় ও কর্মস্থলে বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়।

একটি সমীক্ষায় জানা যায় বিশ্বের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ লোকের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি যা চশমা দিয়ে উন্নত করা সম্ভব। শুধু স্কুলের ছেলেমেয়েদের শতকরা ১৫ ভাগ নিকট-দৃষ্টি, দূর-দৃষ্টি ও অ্যাসটিগম্যাটিজম-এ ভোগে যা চশমা দিয়ে সহজেই সংশোধন করা সম্ভব। এ সকল শিশুর অনেকেরই সময়মতো চোখের পরীক্ষা করে চশমা ব্যবহার না করলে তাদের দৃষ্টির স্থায়ী ক্ষতি হয়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় অ্যামব্লাইওপিয়া (Amblyopia) বলা হয়। কোনো শিশুর যদি এক চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক বা তুলনায় ভালো থাকে এবং অন্য চোখে বেশি ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি থাকে তাহলে সেই চোখে অ্যামব্লাইওপিয়া হয়ে চোখ ট্যারা হয়ে যায়। এসব শিশুরা বড় হলে তখন চশমা দিয়েও আর দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো যায় না বা ট্যারা চোখের সঠিক চিকিৎসাও করা সম্ভব হয় না।

চশমার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা

চশমার ব্যবস্থাপত্র দেবার আগে রোগীকে কয়েকটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। যেমন—

১. দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (Visual Acuity Test) : রোগীর এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ দিয়ে একটি চার্টের বিভিন্ন অক্ষর পড়তে বলা হয়। ইংরেজি, বাংলা, আরবি ইত্যাদি ভাষায় এই চার্টে লেখা থাকে। যারা পড়তে জানে না তাদের জন্য সাধারণত ই চার্ট (E Chart) ব্যবহার করা হয়। এইসব চার্টকে স্নেলেন্‌স চার্ট বলা হয়। রোগী হতে এই চার্ট ৬ মিটার দূরে রাখা থাকে অথবা আয়নার মাধ্যমে দেখানো হলে তিন মিটার দূরে আয়নার মধ্যে এই চার্ট দেখানো হয়।

রোগী স্নেলেন্‌স চার্টের কোন লাইন পর্যন্ত পড়তে পারে তা দেখে চিকিৎসক রোগীর দৃষ্টিশক্তি নির্ণয় করে থাকেন। যারা স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী তারা চার্টের সব অক্ষর পড়তে পারেন এবং তাদের দৃষ্টিকে ৬/৬ বলা হয়। চার্টের কত লাইন ভালোভাবে পড়া যায় তার ওপর নির্ভর করে দৃষ্টিশক্তি ৬/৯, ৬/১২, ৬/১৮, ৬/৩৬, ৬/৬০ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়। যে সকল রোগী স্নেলেন্‌স চার্টের কোনো অক্ষরই পড়তে পারে না তাদের হাতের আঙুল দেখানো হয় এবং কত মিটার দূরে হাতের আঙুল পরিষ্কার দেখে তার ওপর দৃষ্টিক্ষমতা ধরা হয়।

যে সব রোগীদের ৬/৬-এর কম দৃষ্টিশক্তি তাদের 'পিন হোল' নামক ছোট ছিদ্র দিয়ে দেখতে বলা হয়। তারা যদি ঐ ছিদ্র দিয়ে পরিষ্কার দেখেন তাহলে ধরে নেয়া হয় তারা চশমা দিয়ে ভালো দেখবেন। আর যদি ঐ ছিদ্র দিয়ে পরিষ্কার দেখা না যায় তাহলে চোখের কোনো রোগের জন্য ঐ কম দৃষ্টি হবার সম্ভাবনা যা সাধারণত চশমা দিয়ে উন্নত করা যায় না।

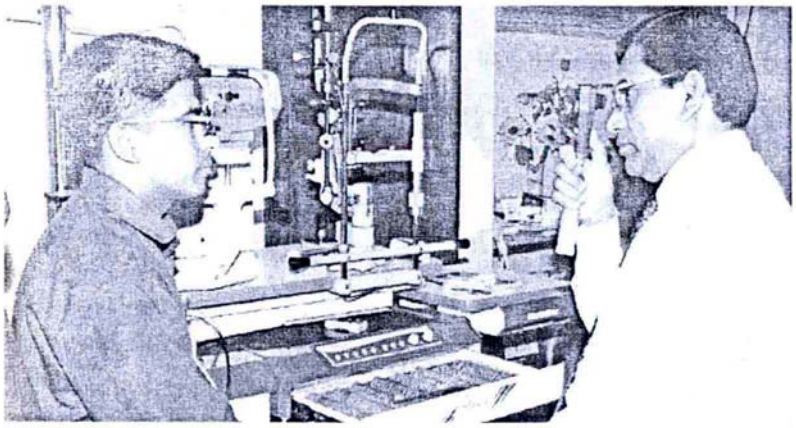

২. রেটিনোস্কোপি (Retinoscopy) : এই পরীক্ষাতে চিকিৎসক একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব হতে রোগীর আনুমানিক চোখের পাওয়ার নির্ণয় করতে পারেন।

বর্তমানে অনেক চিকিৎসক রেটিনোস্কোপি ছাড়াও অটোরিফ্র্যাকটোমিটার (যা কম্পিউটার হিসেবে অধিক পরিচিত)-এর সাহায্যেও রোগীর চোখের আনুমানিক পাওয়ার দেখে থাকেন। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

৩. সাবজেকটিভ টেস্ট (Subjective Test) : এই পরীক্ষাটি রোগীর নিজের পরীক্ষা। চিকিৎসক রেটিনোস্কোপি করে বা অটোরিফ্র্যাকটোমিটারের সাহায্যে আনুমানিক পাওয়ার দেখার পর রোগীর চোখে ট্রায়াল চশমার ফ্রেম বসিয়ে, এক চোখের সামনে অস্বচ্ছ বস্তু রেখে সেই চোখ বন্ধ রাখা হয়। অন্য চোখ দিয়ে দূরের চার্ট পড়তে বলা হয়। আনুমানিক পাওয়ার এবং এর সামান্য বেশি বা কম কয়েকটি লেন্স চোখের সামনে রাখা হয়। রোগী যে লেন্সে সবচেয়ে ভালো দেখবেন, সেই পাওয়ারই ব্যবস্থাপত্রে দেয়া হয়ে থাকে। একই নিয়মে অন্য চোখের পাওয়ারও দেয়া হয়।

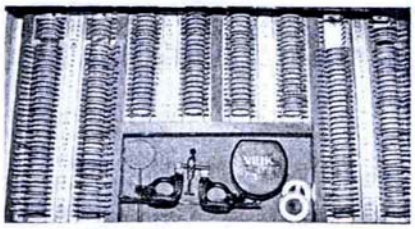

সাবজেকটিভ টেস্ট-এর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পাওয়ারের লেন্স সমৃদ্ধ ট্রায়াল বক্স

কাছের দৃষ্টি পরীক্ষা করার জন্য একটি ছোট-বড় নানা আকারের অক্ষর বা শব্দের ছাপানো কাগজ ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চি দূরে রেখে পড়তে দেয়া হয়। রোগী কোন আকারের শব্দ পড়তে পারেন সে অনুযায়ী তার কাছের দৃষ্টির পাওয়ার দেয়া হয়।

৪. অফথ্যালমোস্কোপি (Ophthalmoscopy) : এই পরীক্ষাটি করে চোখের ভেতরে রেটিনা, অপটিক ডিস্ক, ম্যাকুলা ইত্যাদি দেখা হয়। চল্লিশোর্ধ বয়সের রোগীদের জন্য এই পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের ঐ বয়সে শতকরা ২ জন চোখের উচ্চ চাপ বা গ্লকোমাতে ভোগেন। ঐ রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ণয় হলে গ্লকোমার নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা সহজ এবং ফলপ্রসূ হয়। এ কারণে চশমা দেবার সময় বয়স্ক রোগীদেরকে অফথ্যালমোস্কোপি পরীক্ষা করা দরকার।

৫. স্লিট ল্যাম্প পরীক্ষা (Slit Lamp Examination) : সব রোগীর জন্য এই পরীক্ষা করতে পারলে ভালো। কারণ এই পরীক্ষার সাহায্যে চোখ অনেক বড় দেখা যায় বিধায় চোখের নানা সমস্যা সহজেই চোখে পড়ে। অনেক রোগী চশমা দেয়ার পর যদি আশানুরূপ ভালো দেখতে না পান (যেমন চোখের ছানির প্রাথমিক অবস্থায়) তখন এই পরীক্ষার সাহায্যে চশমা দিয়েও সম্পূর্ণ না দেখার কারণ নির্ণয় করা যায়। চোখের অনেক রোগনির্ণয়ের জন্য এই পরীক্ষাটির প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা

চক্ষুপরীক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটারে চক্ষুপরীক্ষা তুলনামূলক একটি নতুন সংযোজন। আমাদের দেশে এক যুগেরও বেশি আগে থেকে কম্পিউটারে চক্ষুপরীক্ষা শুরু হয়েছে। চক্ষুপরীক্ষা করার কম্পিউটারটি কী জিনিস ? কীভাবে এটা কাজ করে ? কীভাবেই বা এটা একজন মানুষের চোখের পাওয়ার বলে দেয় ? এসব প্রশ্ন অনেকেরই মনে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময় শুধু এই কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যই অনেকে আসেন কম্পিউটারে চোখ পরীক্ষা করাতে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই যন্ত্রটির নাম হচ্ছে অটোরিফ্র্যাক্‌টোমিটার (Autorefractometer) অর্থাৎ যে যন্ত্রে চোখ রাখলে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) চোখের রিফ্র্যাকশন বা পাওয়ার জানিয়ে দেয়। এই যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা অন্যান্য কম্পিউটারের মতো। যন্ত্রটি একটি টেবিল বসানো থাকে। বিভিন্ন কম্পিউটার প্রস্তুতকারী কোম্পানি এবং বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী এর আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে সব কম্পিউটারেই মূলত নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে—

১. একটি টিভি মনিটর

২. রোগীর থুতনি রাখার জায়গা (Chin stand)

৩. রোগীর কপাল স্পর্শ করাবার স্থান (Forehead plate)

৪. বিভিন্ন অপারেটিং নব (যা চিকিৎসক ব্যবহার করেন)।

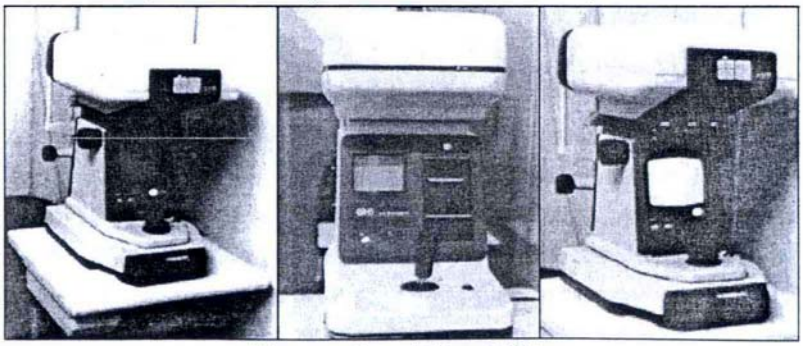

বিভিন্ন কোম্পানির অটোরিফ্রাকটোমিটার

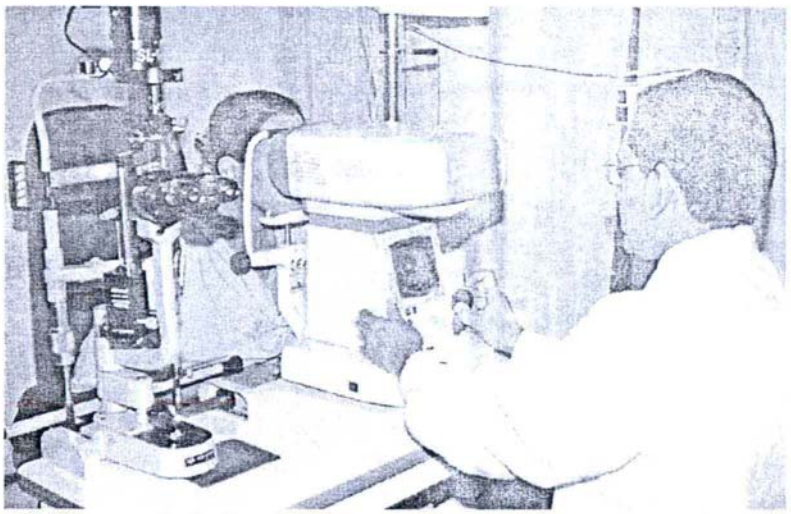

কম্পিউটারের সাহায্যে চোখের পাওয়ার দেখা হচ্ছে।

যন্ত্রটির একদিকে রোগীকে বসানো হয় এবং অন্যদিকে অর্থাৎ টিভি মনিটরের সামনে চিকিৎসক নিজে বসেন। চিন স্ট্যান্ড এবং ফোরহেড প্লেটকে রোগীর উচ্চতা অনুযায়ী ওঠানো-নামানো যায়। চিকিৎসকের দিকে যে অপারেটিং নবগুলি থাকে, তা দিয়ে চিকিৎসক পরীক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী চোখকে সামনে আনতে, পেছনে নিতে বা ডানে-বামে নিতে পারেন। ঐ নব দিয়ে টিভি পর্দার ছবি গাঢ়-হালকা করা যায়। দু'চোখের দূরত্ব মাপা যায় (যা চশমা দেবার জন্য অতি প্রয়োজনীয়)। এছাড়া রয়েছে চিকিৎসকদের বিশেষ টেকনিক্যাল কিছু কাজের জন্য যেমন— যোগ সিলিন্ডার, বিয়োগ সিলিন্ডার বের করা ইত্যাদির জন্য নব। রোগীর পরীক্ষা শেষ হলে টিভির পর্দার বা কোনো কোনো যন্ত্রে আলাদা পর্দায় তার চোখের পাওয়ার (রিডিংটি) ভেসে ওঠে এবং প্রয়োজন হলে প্রিন্টিং নবে চাপ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপিয়ে নেয়া যায়।

কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে

আলোর প্রতিসরণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে এই যন্ত্র দিয়ে চোখের পাওয়ার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। রোগী এই যন্ত্রে চোখ রাখলে যন্ত্রের পেছন থেকে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করে। এই আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করার সময় কিভাবে তা প্রতিসরিত হচ্ছে তা এই যন্ত্র বিশ্লেষণ (Analysis) করে রিডিং দেয়।

রোগী এই যন্ত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী কোম্পানি এবং এর মডেল অনুযায়ী এই ছবিটি বিভিন্ন রকমের হতে

পারে। যেমন কোনো কোনো কম্পিউটারে রোগী একটি তারার মতো বা গোল চাকতির মতো দেখেন। আবার কোনো কোনো যন্ত্রে একটি রাস্তা কাছে থেকে দূরে যাচ্ছে এরকম দেখা যায়। এই ছবিটি রোগীর কাছে মনে হবে যেন অনেক দূরে। এভাবে দূরে মনে হলে তার সামঞ্জস্যকরণ (Accommodation) কমে যায় এবং রিডিং তুলনামূলকভাবে সঠিক হয়ে থাকে। ডান এবং বাম চোখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করে রিডিং নেয়া হয়।

রোগীর চোখে যদি ছানি থাকে, টিউমার থাকে, রক্ত জমা থাকে বা প্রদাহের কারণে চোখে পুঁজ হয়ে থাকে তাহলে ঐ চোখের মধ্যে ঠিকমতো আলো প্রবেশ করতে পারে না বা রেটিনাতে আলো পড়ে না। এসব ক্ষেত্রে কম্পিউটার 'Error' রিডিং দেয় অর্থাৎ এসব রোগীকে চশমা দিয়ে কাজ হবে না। এদের অন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

যাদের চোখে পাওয়ার স্বাভাবিক তাদের সাধারণত Sph 0.00 এবং Cyl 0.00 এভাবে রিডিং আসে।

কম্পিউটার কি সঠিক পাওয়ার বের করতে পারে

এ প্রশ্ন অনেকেরই। অটোরিফ্র্যাক্টোমিটার চোখের পাওয়ার দেবার একটি সর্বাধুনিক যন্ত্র হলেও এরও অনেক সুবিধা (advantage) এবং অসুবিধা (disadvantage) রয়েছে। সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিডিং সঠিক হয়। তবে শতকরা ১০০ ভাগ রোগীর পাওয়ার এই যন্ত্রে সঠিক পাওয়া সম্ভব নয়।

কারণ একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে খুব সামান্য কোনো ত্রুটি থাকলেই এটা ভুল রিডিং দিতে পারে। ভুল রিডিং সাধারণত নিম্নলিখিত কারণগুলোতে আসে—

১. সামান্য ধুলাবালিও যদি এই যন্ত্রের রিফ্র্যাক্শন মিডিয়ার মধ্যে থাকে।

২. রোগীর চোখের সামনে যদি সামান্য একটা চুলও আসে।

৩. কম্পিউটারের নিজস্ব যদি কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে।

এছাড়া রোগী যখন প্রথম এই যন্ত্রে বসেন তখন তিনি যদি নার্ভাস হয়ে যান, ভয় পান তাহলে তার সামঞ্জস্যকরণ সম্পূর্ণ কমে না (accommodation relaxed হয় না) ফলে সঠিক পাওয়ার নির্ণয় অনেক সময় সম্ভব হয় না।

শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে সহজে সামঞ্জস্যকরণ কমানো যায় না ফলে ভুল রিডিং আসতে পারে।

কিভাবে সঠিক রিডিং নেয়া সম্ভব

কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারলে কম্পিউটারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক পাওয়ার নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। যেমন—

১. প্রথমেই রোগীকে যন্ত্রটি সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা দেয়া যাতে পরীক্ষার সময় তারা সহযোগিতা করতে পারেন।

২. যন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট ছবিটি অনেক দূরে দেখা যাবে— এভাবে তাকাতে বলতে হবে। এতে সামঞ্জস্যকরণ কমে রিডিং সঠিক হবে।

৩. চোখের সামনে যেন কোনো চুল, কাপড় বা অন্য কিছু না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৪. যন্ত্রটি সব সময়ই ধুলোবালিমুক্ত পরিষ্কার রাখা দরকার এবং এজন্যে যন্ত্রটিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখলেই সেটা সম্ভব।

৫. রোগীর চোখটি প্রয়োজন মতো উঁচু বা নিচু করে সঠিকভাবে টিভি পর্দার কেন্দ্রে আনতে হবে।

৬. প্রতি তিন মাস অন্তর টেস্ট আই (Test Eye)-এর সাহায্যে এই যন্ত্রের রিডিং সঠিক হয় কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে পর পর তিন দিন এট্রোপিন ড্রপ বা মলম দিয়ে চোখের মণি বড় করে পরীক্ষা করলে সঠিক রিডিং পাওয়া যাবে। উপরের নিয়মগুলো মেনে কম্পিউটারে রিডিং নেবার পরে যদি আবার রেটিনোস্কপি (অনেকের ভাষায় Manual test) করা হয় তাহলে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক পাওয়ার নির্ণয় করা সম্ভব।

কম্পিউটারে কি চোখের সকল পরীক্ষা হয়

বহু রোগী চিকিৎসকের কাছে আসেন চোখের অসুখ নিয়ে। যেমন— চোখের আঘাত, প্রদাহ, লাল চোখ, চোখের ছানি, গ্লকোমা বা চোখের উচ্চচাপ ইত্যাদি নিয়ে। এদের মধ্যে কারো কারো ধারণা যে, কম্পিউটারে দেখালে এসব রোগ ধরা পড়বে এবং চিকিৎসা হবে। এটি একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। চোখের দৃষ্টির পাওয়ার নির্ণয় ছাড়া কম্পিউটার আর কোনো কাজে লাগে না। একজন রোগীর চোখের বাইরে এবং ভেতরে পরীক্ষার জন্য একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন— অফথ্যালমোস্কোপ, স্লিট ল্যাম্প, টনোমিটার, বিভিন্ন লেন্স ইত্যাদি আরো যন্ত্রপাতি। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ চোখ পরীক্ষার একটি সামান্য অংশই হলো কম্পিউটারে চক্ষুপরীক্ষা। তাই কম্পিউটার সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ নেয়াই কাম্য।

চোখের রিফ্র্যাকশন বা প্রতিসরণ

চক্ষু চিকিৎসকদের কাছে বেশির ভাগ রোগীই আসেন রিফ্র্যাকটিভ এরর বা প্রতিসরণের ত্রুটি নিয়ে। এটি চোখের কোনো অসুখ নয়। দুইজন মানুষ যেমন লম্বায় পাঁচ ফুট বা ছয় ফুট হতে পারেন কিন্তু তারা দু'জনই স্বাভাবিক। এভাবে মানুষের চোখের গঠন, আকার, বয়স ইত্যাদি নানা রকম পার্থক্য থাকার দরুন প্রতিসরণের ত্রুটি বা রিফ্র্যাকটিভ এরর থাকতে পারে। এদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামান্য ত্রুটি থাকার দরুন কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। তারা এমনিতেই ভালো বা ৬/৬ দেখতে পারেন। এছাড়া অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই ত্রুটি চশমা বা কন্টাক্ট লেন্সের সাহায্যে ঠিক করা যায়। যে সকল রোগীর কম দৃষ্টি চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স দিয়ে সংশোধন করা যায় না তাদের চোখে কোনো অসুখ থাকতে পারে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা করে তা নির্ণয় করা হয়। চোখের প্রতিসরণ বলার আগে দেখা যাক আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে।

আলোর প্রতিসরণ

আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে চলার সময় ঐ মাধ্যমদ্বয়ের ঘনত্ব অনুযায়ী গতিবেগ ও গতিপথ পরিবর্তন করে। পাতলা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে

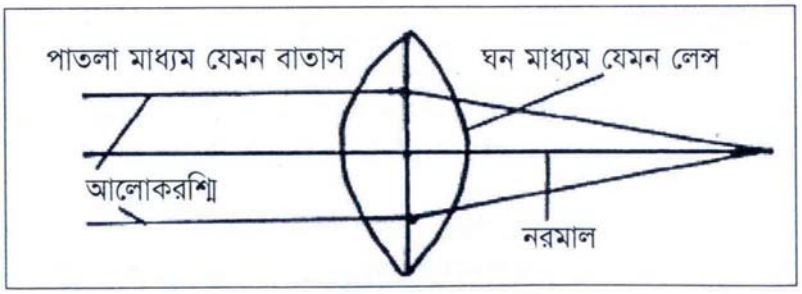

চলার সময় আলোকরশ্মি লম্বের (নরমাল) দিকে অধিক বেঁকে যায়। নিচের ছবিটি দেখুন।

পতিত আলোকরশ্মি কতটুকু বেঁকে যাবে তা নির্ভর করে ঐ ঘন মাধ্যমের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স-এর ওপর।

চোখের প্রতিসরণ

আলোকরশ্মি চোখের ওপর পড়লে, চোখের প্রতিসরণ মাধ্যম, বিশেষ করে কর্নিয়া ও লেন্সের সম্মিলিত প্রায় ৬০ ডায়াপ্টার রিফ্র্যাকটিভ পাওয়ারের কারণে তা বেঁকে যায় ও রেটিনাতে ছবি হয়। ঐ ছবি রেটিনাতে উল্টো হয়ে পড়লেও মস্তিষ্কের সাহায্যে আমরা তা সোজাসুজি দেখতে পাই। চোখের এই প্রতিসরণের ক্ষমতা কারো বেশি আবার কারো কম। খুব অল্প লোকেরই এই ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে। সামান্য ত্রুটি অধিকাংশ স্বাভাবিক চোখে থাকতে পারে যার জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

চোখের সামঞ্জস্যকরণ (Accommodation)

চোখের রিফ্র্যাকটিভ পাওয়ার প্রায় ৬০ ডায়াপ্টার বলা হলেও এই পাওয়ার দূরে ও কাছে দেখার জন্য পরিবর্তিত হয়। দূরের চাইতে কাছে দেখার জন্য প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়ারের। আর চোখের লেন্স-এর আকার পরিবর্তন হয়েই এটা সম্ভব হয়ে থাকে। আগেও বলা হয়েছে কাছে দেখার সময় একটি রিফ্লেক্স-এর মাধ্যমে চোখের সিলিয়ারি পেশি সংকুচিত হয়। ফলে লেন্সের সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ঢিলা হয়, আর তাই লেন্সের সামনের তল এগিয়ে যায়, মোটা হয় এবং এর রিফ্র্যাকটিভ পাওয়ার বাড়িয়ে দেয়। শিশুদের লেন্স নরম থাকে ও এই পাওয়ার বাড়াবার ক্ষমতা থাকে সবচাইতে বেশি। চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিদের লেন্স শক্ত হয়ে এই ক্ষমতা কমতে থাকে। তাই তাদেরকে কাছে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় প্লাস লেন্সের চশমা দেয়া হয়।

লেন্সের এই পাওয়ার বাড়ানোর ক্ষমতাকেই বলা হয় সামঞ্জস্যকরণ বা অ্যাকোমোডেশন। কোনো বস্তু চোখের যত নিকটে আনা হবে, সিলিয়ারি পেশি তত বেশি সংকুচিত হবে— ফলে লেন্স মোটা হয়ে তার রিফ্র্যাকটিভ পাওয়ার সবচেয়ে অধিক হবে। সুতরাং কাছে দেখা, সেলাই বা রান্না ইত্যাদি কাজের জন্য আমাদের অ্যাকোমোডেশন-এর প্রয়োজন।

বস্তু যত দূরে— অ্যাকোমোডেশন-এর প্রয়োজনীয়তা তত কম। এভাবে বস্তুর আকার অনুসারে একটা দূরত্ব পাওয়া যায় যখন কোনো অ্যাকোমোডেশন লাগে না। এই দূরত্বকে বলা হয় পরিষ্কার দেখার সর্বাধিক দূরত্ব। সর্বাধিক দূরত্ব থেকে সর্বাপেক্ষা নিকট দূরত্বের এই মাপকে বলা হয় অ্যাকোমোডেশন-এর দৈর্ঘ্য।

স্বাভাবিক রিফ্র্যাকশন বা ইমেট্রোপিয়া (Emmetropia)

দূর থেকে আগত সমান্তরাল আলোকরশ্মি যদি চোখের অ্যাকোমোডেশন ব্যতীত ঠিক রেটিনায় পতিত হয়, তখন ঐ অবস্থাকে বলা হয় স্বাভাবিক রিফ্র্যাকশন বা ইমেট্রোপিয়া।

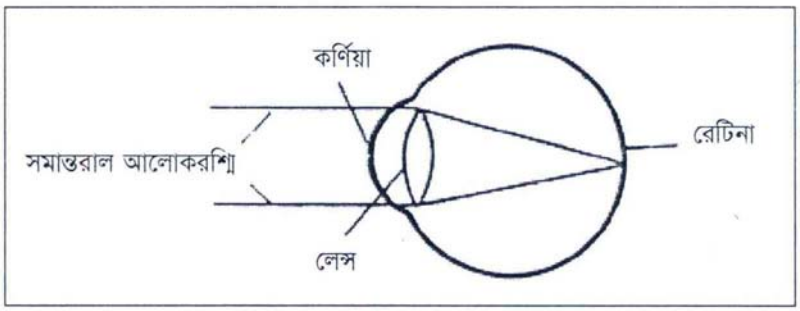

চোখের এরকম অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক কম লোকেরই দেখা যায়। এদের ৪০ বছর পর্যন্ত কোনো চশমার প্রয়োজন হয় না। চল্লিশ বছরের পর লেন্সের পরিবর্তনের কারণে অ্যাকোমোডেশন কমে যায় ও কাছে দেখার জন্য চশমার প্রয়োজন হয়।

রিফ্র্যাকটিভ এরর বা প্রতিসরণ ত্রুটি (Refractive Error)

দূর থেকে আগত সমান্তরাল আলোকরশ্মি যদি চোখের অ্যাকোমোডেশন ব্যতীত ঠিক রেটিনায় পতিত না হয় তখন ঐ অবস্থাকে বলা হয় অ্যামেট্রোপিয়া বা রিফ্র্যাকটিভ এরর। এই রিফ্র্যাকটিভ এরর মূলত তিন ধরনের। যেমন—

১. হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূর-দৃষ্টি
২. মায়োপিয়া বা নিকট-দৃষ্টি
৩. অ্যাস্টিগম্যাটিজম।

হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূর-দৃষ্টি
(Hypermetropia)

দূর থেকে আগত সমান্তরাল আলোকরশ্মি যদি চোখের অ্যাকোমোডেশন ব্যতীত রেটিনার পেছনে পতিত হয় তখন ঐ অবস্থার নাম হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূর-দৃষ্টি।

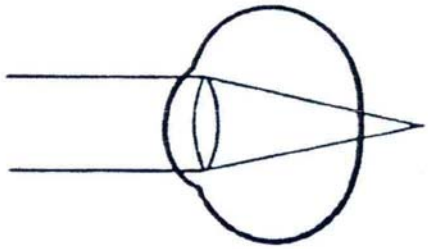

আলোকরশ্মি রেটিনার পেছনে পতিত হয়েছে

ওপরের ছবিতে আলো রেটিনাতে না পড়ার ফলে চোখে ঝাপসা দেখা যাবে। এই অবস্থায় চোখের অ্যাকোমোডেশন-এর সাহায্যে লেন্সের পাওয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়াতে পারলে কিংবা চোখে প্লাস পাওয়ারের উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করলে আলো রেটিনাতে ফোকাস হয়ে স্পষ্ট ছবি দেখা যাবে।

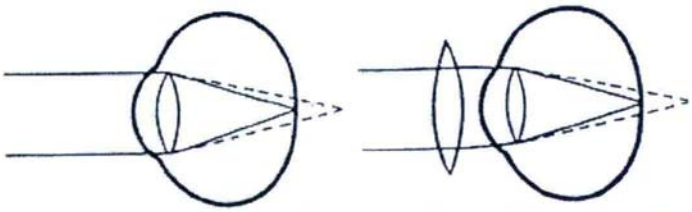

অ্যাকোমোডেশন এর সাহায্যে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে পড়েছে

উত্তল লেন্সের সাহায্যে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে পড়েছে

কারণ

কারণ অনুযায়ী হাইপারমেট্রোপিয়া তিন প্রকার হতে পারে।

১. ছোট চোখ : ছোট চোখে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোখের আয়তন স্বাভাবিকের চাইতে ছোট হয়। এতে লেন্স ও রেটিনার দূরত্ব কমে যায়, ফলে আলো রেটিনার পেছনে একটি কাল্পনিক স্থানে মিলিত হয়। একে বলা যায় এক্সিয়াল হাইপারমেট্রোপিয়া।

২. কারভেচার হাইপারমেট্রোপিয়া : কোনো চোখের কর্নিয়া ও লেন্সের বক্রতা স্বাভাবিকের চাইতে কম থাকলেও আলো রেটিনার পেছনে পতিত হয়।

৩. ইনডেক্স হাইপারমেট্রোপিয়া : কোনো কারণে যদি লেন্সের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স কমে গিয়ে এর পাওয়ার কমে যায়— যেমন বেশি বয়সে ও ডায়াবেটিসে এমনটি হতে পারে।

হাইপারমেট্রোপিয়া ও চশমা

হাইপারমেট্রোপিয়াতে সব সময় চশমার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। শিশুরা ৩ থেকে ৪ ডায়াপ্টার পর্যন্ত হাইপারমেট্রোপিয়াকে অ্যাকোমোডেশন-এর সাহায্যে আলো রেটিনাতে ফেলতে পারে। সুতরাং তাদের কোনো চশমার প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার হাইপারমেট্রোপিয়ার নাম ল্যাটেন্ট হাইপারমেট্রোপিয়া (Latent hypermetropia)। এইসকল শিশুকে কোনো প্লাস লেন্স দিলে তারা দূরে বা কাছে ভালো তো দেখবেই না বরং ঝাপসা দেখবে।

অনেক যুবক-যুবতী যারা ৩০-৩৫ বছর বয়সে দূরে ভালো দেখেন কিন্তু কাছে খুব পরিষ্কার দেখেন না। এদেরকে সামান্য পাওয়ারের প্লাস লেন্স দিলে তারা কাছে পরিষ্কার দেখবেন আবার ঐ লেন্সে দূরে ঘোলা দেখবেন না। এই অবস্থাকে বলা হয়— ম্যানিফেস্ট হাইপারমেট্রোপিয়া (Manifest hypermetropia)। এই সব ব্যক্তিকে প্লাস পাওয়ারের ইউনিফোকাল চশমা দেয়া হয় যা দিয়ে তারা স্বাভাবিক সব কাজই করতে পারেন।

অনেক বয়স্ক লোক আছেন যারা দূরে বা কাছে কোনোটাই ভালো দেখেন না। তাদেরকে সামান্য প্লাস লেন্স দেয়া হলে দূরে ভালো দেখবেন কিন্তু কাছে ভালো দেখেন না। এদের বলা হয় অ্যাবসুলিউট হাইপারমেট্রোপিয়া (Absolute hypermetropia)। এসব ব্যক্তিকে কাছে দেখার জন্য আরো বেশি প্লাস লেন্স যোগ করে বাইফোকাল বা মাল্টিফোকাল চশমা দেওয়ার দরকার হয়।

উপসর্গ

শিশু-কিশোরদের সামান্য হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না। এদের দৃষ্টি দূরে ও কাছে স্বাভাবিক থাকে। অনেক বেশি (High hypermetropia) হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে অবশ্য কাছে দেখার অসুবিধা হতে পারে।

একটু বয়স্ক লোকদের হাইপারমেট্রোপিয়াকে সংশোধন করার জন্য অনবরত সিলিয়ারি পেশিকে সংকুচিত করে অ্যাকোমোডেশন করতে হয়। যার ফলে মাথা ধরা, চোখে ব্যথা, চোখ জ্বালা-পোড়া করা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এছাড়া নিকটে কোনো বস্তু ঝাপসা লাগতে পারে।

চিকিৎসা

কোনো উপসর্গ না থাকলে কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো চশমা লাগে না। তবে বেশি ত্রুটির কারণে চোখে কম দেখলে বা কোনো চোখ ট্যারা থাকলে (Accommodative squint) অবশ্যই চশমা দিয়ে চিকিৎসা করার দরকার হয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে বা কাছে দেখতে অসুবিধা হতে পারে। এরকম সময় রোগীর পেশার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। একজন কৃষক হয়তো কাছে দেখার তেমন প্রয়োজন অনুভব করছেন না, তার জন্য চশমার দরকার না-ও হতে পারে। আবার একই অবস্থার একজন শিক্ষক থাকলে তাঁকে অবশ্যই চশমা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে।

মায়োপিয়া বা নিকট-দৃষ্টি
(Myopia)

দূর থেকে আগত সমান্তরাল আলোকরশ্মি যদি চোখের অ্যাকোমোডেশন ব্যতীত ঠিক রেটিনার ওপর পতিত না হয়ে এর সামনে পতিত হয় তখন ঐ অবস্থাকে বলা হয় মায়োপিয়া বা নিকট-দৃষ্টি।

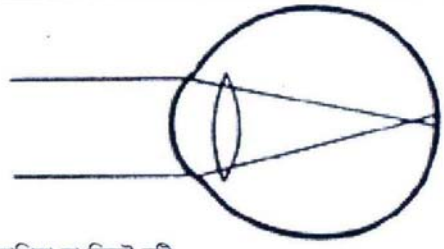

মায়োপিয়া বা নিকট দৃষ্টি
আলোকরশ্মি রেটিনার সামনে পতিত হয়েছে।

মায়োপিয়াতে দূরের বস্তু ঝাপসা দেখা যায় কিন্তু নিকটের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায়। কারণ চোখের পাওয়ার অনুসারে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনায় পতিত হতে পারে। যেমন নিচের ছবিতে আলো চোখের মাত্র এক মিটার দূর থেকে আসায় তা রেটিনাতে পড়েছে।

চোখের মায়োপিয়ার মাত্রার ওপর এই নিকট দূরত্ব নির্ভর করে। যারা খুব

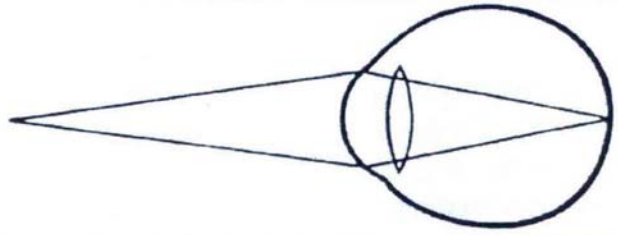

বেশি মাত্রায় মায়োপিক তারা চোখের খুব কাছে যেমন ৮/১০ সেন্টিমিটার-এর মধ্যে না আনলে দেখতে পান না।

কারণ

মায়োপিয়ার কারণ ও চিকিৎসা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কারণ অনুযায়ী মায়োপিয়াকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. এক্সিয়াল মায়োপিয়া (Axial Myopia) : বড় চোখের ক্ষেত্রে লেন্স ও রেটিনার দূরত্ব তুলনায় বেশি হওয়ায় আলোকরশ্মি রেটিনার সামনে ভিট্রিয়াসের কোথাও পতিত হয়। এজন্য দেখা যায়, সুন্দর বড় বড় চোখেও অনেক সময় চশমা লাগে। অবশ্য এটাও মনে রাখা দরকার যে, বড় চোখ হলেই তা মায়োপিক হবে তা নয়। এ ধরনের মায়োপিয়া দুই প্রকার হতে পারে।

ফিজিওলজিক্যাল মায়োপিয়া : জন্মের পর শিশুদের চোখের আয়তন ছোট ও হাইপারমেট্রোপিক থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখেরও আয়তন বড় হতে থাকে এবং একসময় তা মায়োপিক হয়ে যেতে পারে। সাধারণত ২৫ বছর বয়সের পর আর চোখের আয়তন বড় হয় না, ফলে চোখের পাওয়ার স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং পাওয়ার মাইনাস ৬ ডায়াপ্টারের কমই থাকে। এসময় যদি চোখের অন্যান্য অংশ, ফান্ডাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে তবে এই মায়োপিয়াকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল মায়োপিয়া।

প্যাথলজিক্যাল মায়োপিয়া (Pathological Myopia)

চোখের রেটিনার কোনো কোনো অসুখে অনেক সময় চোখ বড় হয়ে যায় এবং তাদের অনেক বেশি মায়োপিয়া হয়। এদের পাওয়ার সাধারণত মাইনাস ৬ ডায়াপ্টারের বেশি হয়, এমনকি মাইনাস ৩০-৩৫ ডায়াপ্টারও হতে পারে। এটি চোখের একটি কঠিন অসুখ। মায়োপিয়া ছাড়াও এদের ভিট্রিয়াস ডিজেনারেশন, রেটিনাল ডিজেনারেশন, রেটিনাল ডিটাচমেন্ট ইত্যাদি জটিলতা হতে পারে। চক্ষু চিকিৎসকগণ চোখের পরীক্ষা করেই এই রোগটি নির্ণয় করে থাকেন।

এসব রোগীর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের এরকম মায়োপিয়া থাকতে পারে। যেহেতু রোগটি বংশগত সেজন্য চাচাতো, মামাতো বা ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে হওয়া উচিত নয়। সেক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদেরও এই ধরনের মায়োপিয়া হতে পারে।

২. কার্ভেচার মায়োপিয়া (Curvature Myopia) : এই মায়োপিয়াতে চোখের কর্নিয়া ও লেন্সের বক্রতা স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক, কিন্তু চোখের আয়তন স্বাভাবিক থাকে। কেরাটোকোনাস, মারফ্যানস্ সিনড্রোম, মারচেজানি সিনড্রোম ইত্যাদি অসুখে এই ধরনের মায়োপিয়া হয়।

৩. **ইনডেক্স মায়োপিয়া (Index Myopia) :** লেন্সের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বেড়ে এই মায়োপিয়া হয়। ডায়াবেটিস রোগে চোখের পানিতে চিনির পরিমাণ বেড়ে গেলে লেন্সেরও পাওয়ার বেড়ে যায়। এছাড়া চোখের এক ধরনের ছানির প্রাথমিক পর্যায়ে লেন্সের ভেতরটা শক্ত হয়ে যায় এবং লেন্সের পাওয়ার বাড়িয়ে দেয়। এই কারণে যারা আগে কাছে দেখার জন্য প্লাস লেন্সের চশমা পরতেন তাদের চোখে এই ধরনের ছানি পড়তে শুরু করলে তারা বিনা চশমাতেই পড়তে সক্ষম হন। অবশ্য ছানি আরো ঘনীভূত (mature) হলে আর কিছু দেখা যায় না।

উপসর্গ

সাধারণত শিশুদের ৪ বছর বয়স পর্যন্ত মায়োপিয়া নির্ণয় হয় না। স্কুলে ভর্তি হবার সময় চক্ষু পরীক্ষাকালে অনেকের মায়োপিয়া ধরা পড়ে। অনেক শিশু ১০/১২ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের চোখে যে কম দেখে তা তারা বুঝতেই পারে না। সুতরাং কোনো উপসর্গ ছাড়াই এরা অনেকদিন চলতে পারে। নিচের উপসর্গগুলিই সাধারণত দেখা যায়।

১. দূরের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায় না।
২. স্বাভাবিক দূরত্বে টেলিভিশন দেখা যায় না। খুব কাছে বসে পরিষ্কার দেখা যায়।
৩. স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পেছনের বেঞ্চে বসে ব্লাকবোর্ডের লেখা ভালো দেখে না, সুতরাং এরা সাধারণত প্রথম বেঞ্চে বসার চেষ্টা করে। বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পড়াশুনায় ভালো হয়।
৪. দূরের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায় না বিধায় অনেক খেলায় এরা মনোযোগী বা পারদর্শী হয় না।
৫. দূরের জিনিস দেখার জন্য প্রায়ই চোখকে কুঁচকিয়ে ছোট করে দেখে, ফলে চোখে ও মাথায় ব্যথা হতে পারে।
৬. কম আলোতে এরা ভালো দেখে না।

চিকিৎসা

চোখের সামনে অবতল বা মাইনাস লেন্স বসিয়ে মায়োপিয়ার চিকিৎসা করা হয়। মাইনাস লেন্সের সাহায্যে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে ফেলতে পারলেই ভালো দেখা যায়।

আধুনিক লেজার এর সাহায্যে অস্ত্রোপাচার করেও চোখের পাওয়ার কমানো হয়। এই পদ্ধতিকেই ল্যাসিক (LASIK) পদ্ধতি বলা হয়। বেশি পাওয়ারের ক্ষেত্রে চশমার পরিবর্তে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা যায়। অনেক দেশে ল্যাসিক ছাড়াও অন্যান্য অস্ত্রোপচার করেও মায়োপিয়ার চিকিৎসা করা হয়। আজকাল উন্নতমানের

কন্টাক্ট লেন্স আবিষ্কার হওয়ায় এবং অস্ত্রোপাচার এর তুলনায় খরচ কম হওয়ায় কন্টাক্ট লেন্সও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

অল্প মাত্রার মায়োপিয়া যেমন মাইনাস ৪ বা তার চেয়ে কম হলে পূর্ণ সংশোধন

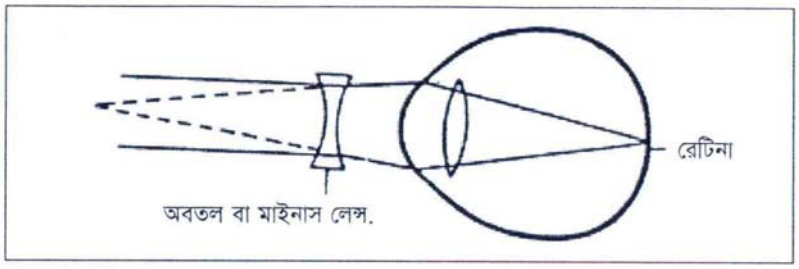

করা সম্ভব হয়। বেশি মাইনাস-এর পাওয়ার প্রয়োজন হলে প্রথম চশমা দেবার সময় সামান্য কম পাওয়ার দেবার নিয়ম, তাতে রোগীর পড়াশুনা করতে অসুবিধে হয় না। অবশ্য পরবর্তী চেক-আপের সময় প্রয়োজনীয় পূর্ণ পাওয়ার দিতে হবে।

বেশি মাইনাস পাওয়ারের চশমায় দৃশ্যমান বস্তু সব ছোট ছোট মনে হয়। দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। বিশেষ করে মাইনাস ১০.০ ডায়াপ্টার বা তার বেশি পাওয়ার হলে এসকল অসুবিধা বেশি হয়। এসব ক্ষেত্রে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে বা ল্যাসিক সার্জারী করে স্বাভাবিক দেখা যেতে পারে।

প্যাথলজিক্যাল মায়োপিয়ার জন্য ৬ মাস পর পর চোখ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। চশমার পাওয়ার ছাড়াও এদের ফান্ডাস, রেটিনা ইত্যাদি ও সম্পূর্ণ পরীক্ষা করা উচিত। এসকল রোগীর অন্যান্য ভাই-বোন, বাবা-মা ও নিকটাত্মীয়দেরও চোখ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সময়মতো এসকল রোগীর রোগ নির্ণয় হলে সুচিকিৎসা দেয়া সম্ভব। অন্যথায় অনেকের চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

অ্যাসটিগম্যাটিজম
(Astigmatism)

চোখের কর্নিয়া বা লেন্সের অসম গঠনের জন্য দূর থেকে আগত আলোকরশ্মি যদি রেটিনায় একটি বিন্দুতে না পড়ে একটি লাইনে পড়ে তখন এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যাসটিগম্যাটিজম। একটি সহজ উদাহরণ দেয়া যাক। কর্নিয়ার ত্রুটির কারণে একটি চোখের পাওয়ার যদি খাড়াভাবে (Vertical) স্বাভাবিক ৬০ ডায়াপ্টার এবং আড়াআড়িভাবে (Horizontal) ৫৮ ডায়াপ্টার থাকে, তাহলে আড়াআড়িভাবে ২ ডায়াপ্টার কম থাকার দরুন আলোকরশ্মি রেটিনার একটি বিন্দুতে পড়বে না। ঐ অবস্থায় +২.০ ডায়াপ্টার সিলিন্ডার লেন্স ঐ মধ্যরেখাতে (Meridian) চশমার মাধ্যমে বসিয়ে দিলে চোখের পাওয়ার আড়াআড়ি ও খাড়াভাবে (Horizontal ও Vertical Meridian) ৬০ ডায়াপ্টার হয়ে যাবে বলে আলো রেটিনাতে বিন্দু হিসেবে পড়বে ও পরিষ্কার দেখা যাবে।

উপসর্গ

১. দূরের বা নিকটের বস্তু অস্পষ্ট দেখা যেতে পারে। চোখের পাতা কুঁচকিয়ে ছোট করলে অনেক সময় বস্তু পরিষ্কার দেখা যেতে পারে।

২. দূরের বস্তু কিছুটা বাঁকা দেখা যেতে পারে।

৩. বেশির ভাগ রোগী চোখের ব্যথা, মাথা ব্যথা ও চোখে অস্বস্তি বোধ করেন।

৪. অল্প বয়সের রোগীদের পড়ার সময় মাঝে মাঝে অক্ষর ঝাপসা হয়ে যেতে পারে।

কী কী কারণে অ্যাসটিগম্যাটিজম হয়

চোখের লেন্স ও কর্নিয়ার গঠন সব মানুষের এক নয়। সুতরাং অনেকেরই জন্মগত চোখের সমস্যা বিশেষ করে কর্নিয়ার অসম গঠনের জন্যই সামান্য অ্যাসটিগম্যাটিজম হয়। এ ধরনের অ্যাসটিগম্যাটিজম-এ সাধারণত কোনো চশমা বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে চোখে কম দেখলে কিংবা কোনো উপসর্গ থাকলে অবশ্যই সামান্য অ্যাসটিগম্যাটিজম-এর জন্যও চশমা ব্যবহার করতে হয়। জন্মগত অ্যাসটিগম্যাটিজম ছাড়া আরও অনেক কারণে অ্যাসটিগম্যাটিজম হতে পারে। যেমন—

১. কর্নিয়ার ক্ষত বা প্রদাহ হয়ে সেখানে দাগ হয়ে গেলে।
২. চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের পরে।
৩. কর্নিয়াতে কোনো অস্ত্রোপচার হলে।
৪. চোখের ওপরের পাতায় কোনো টিউমার যেমন ক্যালজিয়ন যদি কর্নিয়ার ওপর চাপ দেয়।
৫. কর্নিয়ার অসুখ বিশেষ করে কেরাটোকোনাস— যেখানে কর্নিয়া গোল না হয়ে ফানেলের মতো কোনাকৃতির হয়ে থাকে।

প্রকারভেদ

অ্যাসটিগম্যাটিজম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বেশিরভাগ অ্যাসটিগম্যাটিজম-এ সিলিন্ডার লেন্সের চশমা পরে ঠিক দেখা যায় ও উপসর্গসমূহের উপশম হয়। এই ধরনকে বলা হয় নিয়মিত বা রেগুলার অ্যাসটিগম্যাটিজম।

বাকি অন্যান্য ধরনের অ্যাসটিগম্যাটিজম যা সাধারণত কর্নিয়ার অসুখ কেরাটোকোনাস ও কর্নিয়ায় বড় রকমের দাগ থাকলে হয় এবং সাধারণ সিলিন্ডার লেন্সের চশমা দিয়ে সঠিক দেখা যায় না। এসব ক্ষেত্রে এক ধরনের কন্টাক্ট লেন্স (RGP) ব্যবহার করে ভালো দেখা যায়। যারা কন্টাক্ট লেন্সেও ভালো দেখতে পারেন না তাদের কর্নিয়াকে কেটে ফেলে দিয়ে অন্য মৃত মানুষের স্বাভাবিক কর্নিয়া সংযোজন করা হয়ে থাকে। (কর্নিয়া গ্রাফটিং বা Keratoplasty).

রেগুলার অ্যাসটিগম্যাটিজমকে আবার সিম্পল মায়োপিক বা হাইপার মেট্রোপিক অ্যাসটিগম্যাটিজম, কম্পাউন্ড মায়োপিক বা হাইপারমেট্রোপিক অ্যাসটিগম্যাটিজম এবং মিক্সড অ্যাসটিগম্যাটিজম ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। চক্ষু-চিকিৎসকগণ বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এই অ্যাসটিগম্যাটিজম-এর ধরন নির্ণয় করে উত্তল, অবতল, স্ফেরিক্যাল ও সিলিন্ডার লেন্সের সাহায্যে চশমা দিয়ে থাকেন।

চিকিৎসা

মায়োপিয়া কিংবা হাইপারমেট্রোপিয়ার তুলনায় অ্যাসটিগম্যাটিজম-এর চিকিৎসার জন্য রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই বেশি মনোযোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। অ্যাসটিগম্যাটিজম-এর সঠিক ধরন নির্ণয় করে সঠিক চশমা দেয়া গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী ভালো হয়ে যান। তবে অনেকে প্রথম ২/১ সপ্তাহ চশমা ব্যবহার করে আরাম পান না। কোনো সোজা বস্তুকে বাঁকা দেখা যায়। রাস্তা উঁচু-নিচু দেখা যেতে পারে। অনেকের মাথা বা চোখের ব্যথা বেড়ে যায়। ধৈর্য্য ধরে ২/১ সপ্তাহ চশমা ব্যবহার করলে এসকল সমস্যা কাটানো সম্ভব।

এরপরও যারা চশমা ব্যবহার করে স্বস্তি পান না তাদেরকে পুনরায় পরীক্ষা করে তাদের পাওয়ার ঠিক আছে কিনা দেখা হয়। সব ঠিক থাকলেও অনেক রোগী বেশি সিলিন্ডার থাকার দরুন অস্বস্তিতে ভোগেন। এদের বেলায় চক্ষু চিকিৎসকগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পাওয়ারের সামান্য তারতম্য করে থাকেন।

বেশি সিলিন্ডার পাওয়ার থাকলে এই পাওয়ারের স্ফেরিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট পাওয়ার দেয়া যেতে পারে। তাতে দৃষ্টির প্রখরতা একটু কমে গেলেও রোগী আরাম অনুভব করেন। যেমন ধরা যাক, কারও চোখের পাওয়ার +২.০০ ডায়াপ্টার স্ফেরিক্যাল ও +৩.০০ ডায়াপ্টার সিলিন্ডার × ১৮০°। এখানে সিলিন্ডার পাওয়ার ৩.০০ ডায়াপ্টার-এর পরিবর্তে যদি ১.০০ ডায়াপ্টার করা হয় ও যে ২.০০ ডায়াপ্টার কমানো হলো এর অর্ধেক অর্থাৎ ১.০০ ডায়াপ্টার, স্ফেরিক্যাল পাওয়ারের সাথে যোগ করা হয় তাহলে তার নতুন পাওয়ার হবে +৩.০০ ডায়াপ্টার স্ফেরিক্যাল ও + ১.০০ ডায়াপ্টার সিলিন্ডার × ১৮০°। এইভাবে সিলিন্ডার পাওয়ার কমিয়ে স্ফেরিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট পাওয়ার দিলে অনেক রোগী আরামেই চশমা পরতে পারেন।

চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া
(Presbyopia)

অধিকাংশ চল্লিশোর্ধ স্বাভাবিক মানুষ নিকটে খুব পরিষ্কার দেখতে পারেন না। যার ফলে পড়াশুনা, সেলাই বা অন্যান্য নিকটের কাজ করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এটা চোখের কোনো অসুখ বা রিফ্র্যাকটিভ এরর নয়, বরং বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলে চোখের অ্যাকোমোডেশন বা সামঞ্জস্যকরণ কমে যাবার ফলেই কাছে দেখতে অসুবিধা হয়। চোখের এই অবস্থাকেই বলা হয় চল্লিশা, চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া।

চালশে কেন হয়

শিশু বা কিশোরদের নিকটে দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না অথচ বয়স বাড়লেই এই অসুবিধা হয়। যত বয়স বেশি হবে তত এই কাছে দেখার অসুবিধা প্রকট হতে থাকে। দূরে ও নিকটে দেখার জন্য চোখের লেন্সের পাওয়ার-এর পরিবর্তন হয়। দূরে দেখতে যে পাওয়ার প্রয়োজন, কাছে দেখার জন্য তার চেয়ে বেশি পাওয়ারের প্রয়োজন। আমাদের চোখের লেন্স অ্যাকোমোডেশন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পাওয়ার বাড়িয়ে থাকে। কাছে দেখার সময় চোখের সিলিয়ারি মাংশপেশির সংকোচনের ফলে লেন্সের জনিউলগুলি ঢিলা হয়ে লেন্সের সামনে-পেছনের পুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। লেন্সের ইলাস্টিকের মতো পুরুত্ব বাড়াবার ও কমাবার ক্ষমতা আছে। লেন্সের পুরুত্ব বাড়লে এর পাওয়ারও বেড়ে যায়।

শিশু-কিশোরদের এই সিলিয়ারি মাংশপেশি সংকোচনের ক্ষমতা ও লেন্সের ইলাস্টিসিটি অনেক বেশি হওয়ায় কাছে দেখার সময় লেন্সের পাওয়ার অনেক বেশি ডায়াপ্টার বাড়াতে পারে। এই ক্ষমতাকেই বলা হয় অ্যাকোমোডেশন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই অ্যাকোমোডেশন ক্ষমতা কমতে থাকে। যেমন—

০৮ বছর বয়সে : ১৪ ডায়াপ্টার অ্যাকোমোডেশন

২০ বছর বয়সে : ১১ ডায়াপ্টার অ্যাকোমোডেশন

৩০ বছর বয়সে : ৯ ডায়াপ্টার অ্যাকোমোডেশন

৫০ বছর বয়সে : ২ ডায়াপ্টার অ্যাকোমোডেশন

৬০ বছর বয়সে : শূন্য ডায়াপ্টার অ্যাকোমোডেশন

এই চার্ট থেকে সহজেই বোঝা যায়— স্বাভাবিক নিয়মেই বয়স ৪০ বছরের কাছাকাছি হলে কাছে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাকোমোডেশন কমে যায়, ফলে কাছের বস্তু ঝাপসা দেখা যায়। এ সময় ঐ বস্তুকে একটু দূরে রাখলে আবার পরিষ্কার দেখা যায়, কারণ ঐ দূরত্বে দেখার জন্য তুলনায় কম পাওয়ারের প্রয়োজন। এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় পাওয়ারের চশমা দিলে নিকটের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায়।

চালশের উপসর্গ

১. কাছের বস্তু ঝাপসা দেখা যায় এটাই প্রধান উপসর্গ।

২. প্রথম প্রথম অল্প আলোতে এবং দিনের শেষে পড়তে অসুবিধা হতে পারে।

৩. নিকটের ঝাপসা বস্তুকে পরিষ্কারভাবে দেখার চেষ্টা করায় বেশি মাত্রায় অ্যাকোমোডেশন করতে হয়। এর ফলে অনেকের মাথা ব্যথা, চোখে ব্যথা ও অস্বস্তি হতে পারে।

চালশের চিকিৎসা

প্রয়োজনীয় ও সঠিক চশমা ব্যবহার করাই চালশের একমাত্র চিকিৎসা। অনেকের একটি সাধারণ ধারণা আছে— প্লাস পাওয়ারের চশমা দিলেই নিকটে দেখা যায়। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ কোনো ব্যক্তির দূরে দেখার পাওয়ারের ওপরই নির্ভর করবে তার নিকটে দেখার পাওয়ার। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ৪০ বছরের কোনো ব্যক্তি যদি চশমা ছাড়া দূরে ঠিক দেখেন তাহলে তার নিকটে সাধারণত +১.০০ ডায়াপ্টার স্ফেরিক্যাল পাওয়ারের প্রয়োজন। দূরের বস্তু দেখার জন্য যদি +২.০০ ডায়াপ্টারের প্রয়োজন হয় তাহলে কাছে দেখার জন্য +২.০০+১.০০ = +৩.০০ ডায়াপ্টার পাওয়ারের দরকার হবে। আবার তার দূরে যদি— ২.০০ ডায়াপ্টারের প্রয়োজন হয় তখন কাছের জন্য প্রয়োজন হবে— ২.০০+১.০০ = –১.০০ ডায়াপ্টার অর্থাৎ নিকটে দেখার জন্য মাইনাস পাওয়ারের প্রয়োজন। চক্ষু চিকিৎসকগণ এজন্য রোগীর দূরের পাওয়ার নির্ণয় করে তার সঙ্গে নিকটের প্রয়োজনীয় পাওয়ার যোগ করে চশমা দিয়ে থাকেন।

চালশে ও চশমা

যেহেতু চশমা ছাড়া চালশের কোনো চিকিৎসা নেই সেজন্য কোনো ব্যক্তি কতটা লেখাপড়া বা কাছের কাজ করেন, কতটা দূরে রেখে লেখাপড়া করার অভ্যাস, তিনি কোন পেশার লোক ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে চশমার পাওয়ার দিতে হবে।

এছাড়া দূরে দেখার পাওয়ার লাগলে তাদেরকে বাইফোকাল, ট্রাইফোকাল বা মাল্টিফোকাল চশমা দিতে হবে। যাদের দূরে দেখার অসুবিধা নেই তাদেরকে শুধু রিডিং গ্লাস (ইউনিফোকাল) দেয়া যেতে পারে। রোগীর প্রয়োজনীয় দূরত্বে সবচেয়ে কম পাওয়ার দেওয়াই রোগীর জন্য আরামদায়ক।

রিডিং গ্লাস

যে সকল ব্যক্তি আগে কখনো চশমা পরেন নাই এবং দূরের বস্তু পরিষ্কার দেখেন তাদের জন্য ফ্রেমে রিডিং গ্লাসই উত্তম। প্রথমবারেই বাইফোকাল চশমা অনেকে গ্রহণ করতে চান না। অনেকের ধারণা বাইফোকাল চশমা পরলে তাদেরকে বেশি বয়স্ক মনে হয়।

বাইফোকাল চশমা
(Bifocal Glass)

বয়স্ক ও মাঝবয়সী লোকের কাছে বাইফোকাল চশমা সর্বাধিক পরিচিত। এই বয়সে পড়াশুনার জন্য বা নিকটে দেখার জন্য তাদেরকে বাইফোকাল চশমা পরতে হয়। এই চশমাতে ২টি ফোকাস করার জন্য ২ ধরনের পাওয়ার থাকে। চশমার উপরের অংশ দিয়ে দূরের বস্তু দেখা যায়। যাদের দূরে দেখার জন্য পাওয়ারের প্রয়োজন হয় না তাদের ক্ষেত্রে এই অংশে শূন্য পাওয়ার থাকে। আর চশমার নিচের অংশে থাকে কাছে দেখার পাওয়ার। কাছে দেখার অংশকে বলা হয় রিডিং সেগমেন্ট। রিডিং সেগমেন্টটি বিভিন্নভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

বাইফোকাল চশমার প্রকারভেদ

বাইফোকাল চশমা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন—

১. ক্রিপটক বা ফিউজড বাইফোকাল
২. এক্সিকিউটিভ বাইফোকাল
৩. আলটেক্স বাইফোকাল
৪. সিমেন্ট বাইফোকাল

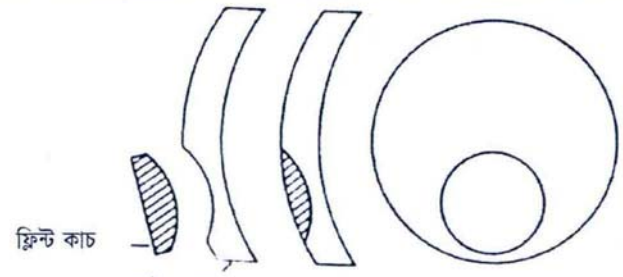

ক্রিপটক বা ফিউজড বাইফোকাল

১. ক্রিপটক বা ফিউজড্ বাইফোকাল (Kryptok, Fused bifocal) : এই চশমাতে কাচের নিচের দিকে গর্ত করে সেখানে অতিরিক্ত পাওয়ারের অন্য কাচ জোড়ানো হয় বা ফিউজড্ করা হয়, আর এজন্যই এর নাম ফিউজড্ বাইফোকাল।

এই ধরনের বাইফোকাল আমাদের দেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এই চশমার সুবিধা হলো—

ক. দূর থেকে নিচের সেগমেন্টের দাগ বোঝা যায় না।

খ. তুলনামূলকভাবে দামে কম।

ক্রিপটক বাইফোকালের অসুবিধা হচ্ছে

ক. ইমেজ জাম্পিং : এই চশমা দিয়ে উপরে-নিচে তাকাবার সময় মনে হয় যেন দৃশ্যমান বস্তু ওঠানামা করে। উপরে ও নিচে আলাদা পাওয়ার এবং এদের অপটিক্যাল সেন্টার আলাদা ও দূরে থাকার কারণে এমনটা হয়। ২/১ সপ্তাহ চশমা ব্যবহার করার পর অভ্যাস হয়ে যায়।

খ. ক্রোমাটিক ডিসপারসন (Chromatic dispersion) : সাধারণত দূরের পাওয়ারের চাইতে রিডিং সেগমেন্ট-এর পাওয়ার +১.৫০ ডায়াপ্টার বেশি হলে রঙের প্রতিফলন হতে পারে। অল্প পাওয়ারে এই অসুবিধা হয় না। ব্যবহার করতে করতে এই অসুবিধাও অভ্যাস হয়ে যায়।

২. এক্সিকিউটিভ বাইফোকাল (Executive bifocal) : এই চশমাতে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ থাকে। উপরের অংশ দিয়ে দূরের বস্তু এবং নিচের অংশ দিয়ে নিকটের বস্তু দেখা যায়।

উপরের অংশের সেন্টার (Optical center) থাকে কাচের ঠিক নিচে এবং নিচের অংশের সেন্টার থাকে কাচের উপরিভাগে, সুতরাং কার্যত এই দুটি সেন্টার একটি অপটিক্যাল সেন্টারের ন্যায় কাজ করে। এতে বাইফোকালের একটি অসুবিধা ইমেজ জাম্পিং বা দৃশ্যমান বস্তুর ওঠা-নামা কমে যায়।

এই ধরনের বাইফোকাল অনেক পেশার লোক পছন্দ করে থাকেন। নিচের রিডিং সেগমেন্ট অনেক বড় হওয়ায় অনেকে পড়াশুনা করতে আরাম বোধ করেন।

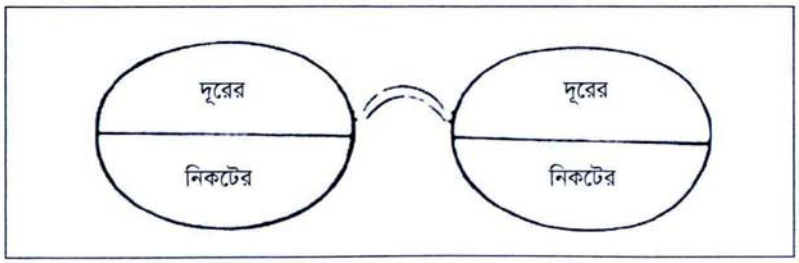

যদিও পড়াশুনার জন্য নিচের সেগমেন্ট ২০ মিলিমিটার-এর বেশি বড় করার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা পড়ার সময় চশমার উপরে মাত্র ৬ মিলিমিটার চোখ ঘোরাই।

এক্সিকিউটিভ বাইফোকাল-এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। যেমন—

ক. চশমার মাঝখানে পরিষ্কার দাগ দেখা যায়।

খ. সাধারণত অন্য বাইফোকালের চাইতে ভারী হয়।

গ. দূরের ও কাছের সেগমেন্টের জোড়াতে বা ঐ দাগের জন্য আলোর প্রতিফলন বেশি হয় যা অনেকে গ্রহণ করতে পারেন না।

৩. আলটেক্স বাইফোকাল (Ultex bifocal) বা এক লেন্সের বাইফোকাল (One piece bifocal) : এই চশমাকে গ্রাউন্ড সেগমেন্ট (Ground segment) বাইফোকালও বলা হয়। এখানে কাচের নিচের অংশে গ্রাইন্ডিং করে বা ঘষে নিচের পাওয়ার তৈরি করা হয়। এই চশমার নিচে কোনো দাগ দেখা যায় না, তবে হাত দিয়ে অনুভব করলে রিডিং সেগমেন্টটি উঁচু বোঝা যাবে। এই বাইফোকাল যেহেতু

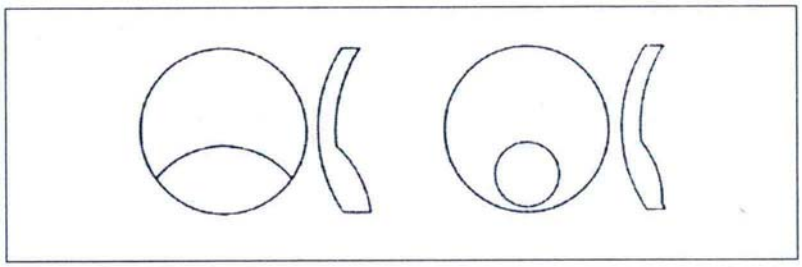

একই কাচ থেকে তৈরি সেজন্য এখানে কোনো রঙের প্রতিফলন হয় না।

এই চশমার অসুবিধা হচ্ছে—

১. তুলনামূলকভাবে দাম বেশি।

২. ক্রিপটক বাইফোকালের মতো 'ইমেজ জাম্পিং' হয়।

আলটেক্স বাইফোকালের রিডিং সেগমেন্ট ২২ মিলিমিটার থেকে ৩৮ মিলিমিটার পর্যন্ত পাওয়া যায়। যারা বড় রিডিং সেগমেন্ট পছন্দ করেন তাদের জন্য এই ধরনের বাইফোকাল বেশ উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের আলটেক্স বাইফোকাল কাচের ছবি দেয়া হলো।

৪. সিমেন্ট বাইফোকাল (Cement bifocals) : এই চশমাতে কাছের পাওয়ারের জন্য ছোট আকারের একই ধরনের কাচের তৈরি লেন্সকে কানাডা ব্যালসাম (Canada Balsam) নামক আঠা দিয়ে দূরের পাওয়ারের কাচের নিচের অংশে লাগানো হয়। আলাদা লেন্সটি পরিষ্কার দেখা যায়। এই লেন্সের পাশে ধুলা

ময়লা জমে এবং ঐ ক্যানাডা ব্যালসাম কিছুদিনের মধ্যে হলুদ হয়ে যায়। অনেক সময় আঠা কমে গিয়ে রিডিং সেগমেন্ট লেন্সটি খুলে যেতে পারে। এসকল অসুবিধার কারণে আজকাল সিমেন্ট বাইফোকাল তেমন ব্যবহৃত হয় না। আধুনিক উত্তপ্ত আঠা (Thermal cement) দিয়ে লেন্স আটকালে অবশ্য খুলে আসার ভয় থাকে না এবং রঙও হলুদ হয় না।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সিমেন্ট বাইফোকাল ব্যবহার করা হয়, যেমন—

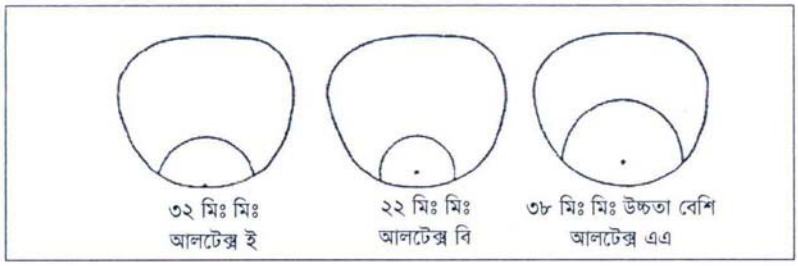

১. ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত +২.০০ ডায়াপ্টার রিডিং সেগমেন্ট-এর চশমা প্রয়োজন হলে।
২. কোনো ব্যক্তির (যেমন— লাইব্রেরিয়ান, বুককিপার) বিশেষ কাজের জন্য চশমার কাচের যে-কোনো স্থানে এই ছোট লেন্সটি বা সেগমেন্টটি বসানোর প্রয়োজন হলে।

রিডিং সেগমেন্টের প্রকারভেদ

সব বাইফোকালের রিডিং সেগমেন্ট একরকম নয়। কোনোটি গোল, কোনোটি ইংরেজি 'D' অক্ষরের ন্যায়। কোনোটি আবার চশমার অর্ধেক। এছাড়া আরো অনেক রকমের রিডিং সেগমেন্ট পাওয়া যায়।

রিডিং সেগমেন্ট কোনটি ভালো ? প্রায়ই আমাদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। আসলে আমাদের পড়ার সময় চোখ মাত্র ১২° এদিক থেকে ওদিকে ঘোরে, যার জন্য রিডিং সেগমেন্ট প্রয়োজন মাত্র ৬ মিলিমিটার। সুতরাং উপরের সব ধরনের রিডিং সেগমেন্ট দিয়েই পড়াশুনা করতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। তবে ব্যক্তিগত ও পেশাগত দিক বিবেচনা করে রিডিং সেগমেন্ট নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন একজন টাইপিস্ট, লাইব্রেরিয়ান, বুক-কিপার, বাদক এদেরকে বড় আকারের রিডিং সেগমেন্ট দেয়া যেতে পারে। বড় সেগমেন্টের উচ্চতা বেশি হওয়ায় তারা মুখ বেশি উঁচু না করেও দৃশ্যমান বস্তু দেখতে পারেন। রিডিং সেগমেন্টকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১. রাউন্ড টপ বা কার্ভড টপ (Round top/curved top)— এই সেগমেন্টকে 'মুন শেপ'ও বলা হয়।
২. ফ্লাট টপ (Flat top) বা ডি-সেগমেন্ট।
৩. স্ট্রেইট (Straight accross) — এই সেগমেন্টের নিচে কিছু অংশ দিয়ে

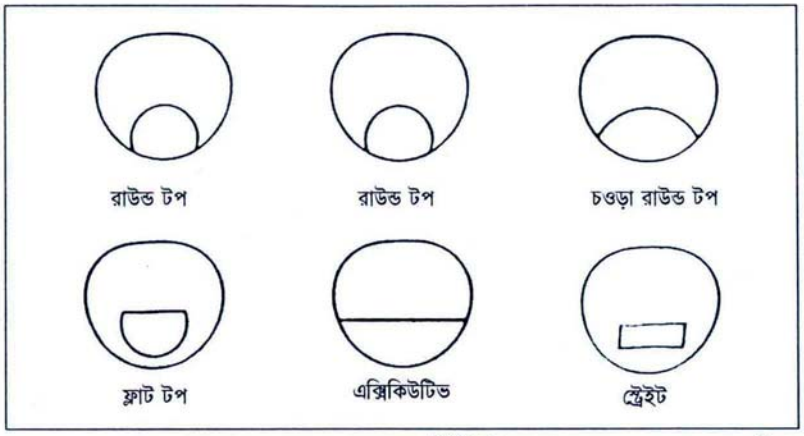

আবার দূরের বস্তু দেখা যায় এবং সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অনেকে সুবিধা মনে করেন। যদিও অন্যান্য বাইফোকাল সেগমেন্ট ব্যবহারকারীগণ মাথা নিচু করে উপরের অংশ দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে নেমে থাকেন।

বাইফোকাল চশমার অসুবিধা

বাইফোকাল চশমা দিয়ে প্রথম প্রথম কোনো অসুবিধা হয় নি এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। কম বেশি সবারই কোনো না কোনো অসুবিধা হয়। যেমন—

১. উঁচু-নিচু দেখা যেতে পারে।
২. দৃশ্যবস্তু ওঠা-নামা করতে পারে।
৩. সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ঝাপসা দেখা যেতে পারে।
৪. নির্দিষ্ট দূরত্বে পরিষ্কার দেখা গেলেও তার থেকে কাছে বা আরো দূরে ঝাপসা দেখা যাবে।
৫. প্রথম পরিষ্কার দেখা গেলেও কিছুক্ষণ পর ঝাপসা হয়ে যেতে পারে বা মাথাব্যথা হতে পারে।
৬. নিকট-দৃষ্টির (Myopic) লোকেরা বাইফোকাল চশমার চেয়ে খালি চোখে পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন।
৭. আলোর প্রতিফলন হতে পারে।

বাইফোকাল চশমা অভ্যাসের নিয়ম

বইফোকাল চশমা প্রথমবার ব্যবহার করতে গিয়ে অসুবিধা হয় নি এমন লোকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি ২/১ সপ্তাহ ব্যবহারের পর সঠিক অভ্যাস হয় নি বা অসুবিধা রয়ে গেছে এমন লোকের সংখ্যাও কম।

শতকরা ৯৫ জন লোক মাত্র ২/১ সপ্তাহের মধ্যেই এই চশমা ব্যবহারের কায়দা রপ্ত করে ফেলেন ও অভ্যাস করে ফেলেন। বাকি শতকরা পাঁচজনকে পুনঃপরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। সঠিক বাইফোকাল চশমার জন্য প্রয়োজন—

১. সঠিকভাবে চোখ পরীক্ষা

২. সঠিক লেন্সটি চশমার ফ্রেমে ফিট করা

৩. রোগীকে বাইফোকাল সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দেয়া। যেমন—

ক. এই চশমা দিয়ে ৬ মিটার দূরে দেখা যাবে ও নিকটে ১২″-১৬″ দূরে দেখা যাবে। মধ্যবর্তী স্থানে পরিষ্কার দেখা যাবে না। ঐ দূরত্বে দেখতে চাইলে ট্রাইফোকাল বা মাল্টিফোকালের প্রয়োজন হয়।

খ. নিকটের বস্তু দেখার জন্য স্বাভাবিকের ন্যায় সোজা তাকালে দেখা যাবে না। বরং রিডিং সেগমেন্টের ভেতর দিয়ে তাকালেই দেখা যাবে। আর এই রিডিং সেগমেন্টের ভেতর তাকাতে হলে— মুখটি একটু উঁচু করে নিতে হবে অথবা পড়ার বইটিকে একটু নিচে নামাতে হবে।

গ. সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় চোখ ও সিঁড়ির দূরত্ব ১৬´-এর বেশি হওয়ায় সেগমেন্টের ভেতর দিয়ে তাকালে ঝাপসা দেখা যাবে, বরং মাথা নিচু করলে চশমার উপরের অংশ দিয়ে তুলনামূলকভাবে সিঁড়ি পরিষ্কার দেখা যাবে।

ঘ. বাইফোকাল চশমা দিলেই অল্প বয়স্কদের ন্যায় সব দূরত্ব ভালো দেখা যায় না। এই চশমার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তবে ট্রাইফোকাল ও ক্রমবর্ধমান পাওয়ারের লেন্স দিয়ে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব। ওপরের তিনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কারো বাইফোকাল চশমা অভ্যাস করতে অসুবিধা হয় তাহলে তাকে পুনরায় পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে। ফিটিং পরিবর্তন করার দরকার

হতে পারে। এছাড়া প্রতিদিন অল্প অল্প করে অভ্যাস করতে পারেন। অনেক চক্ষু-চিকিৎসক নিকটে দেখার জন্য দুই চোখে ০.২৫ থেকে ০.৫০ ডায়াপ্টার পাওয়ার কম-বেশি দিয়ে থাকেন— যাতে নিকটে দেখার রেঞ্জ বেশি হয়।

বাইফোকাল চশমার ইতিহাস

আমেরিকার রাজনীতিবিদ ও বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন তাঁর নিজের জন্য প্রথম বাইফোকাল চশমা তৈরি করেন ১৭৮৪ সালে। যদিও ১৭৭৫ সালে তিনি একটি ফ্রেমের মধ্যে দূরের ও কাছের লেন্স দিয়ে দেখার কথা প্রথম ভেবেছিলাম।

বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (১৭০৬-১৭৯০) পিতার দশ সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ। তিনি আমেরিকার বোস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২০ বছর বয়সে লণ্ডন থেকে মুদ্রণ বিষয়ে পড়াশুনা শেষে ফিলাডেলফিয়াতে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেন। 'পেনসিলভানিয়া গেজেট' নামে তখনকার দিনে আমেরিকার সর্বাধিক প্রচলিত সংবাদপত্র তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। তার ঐ পত্রিকাতেই আমেরিকার প্রথম উপন্যাস রিচার্ডসনের 'পামেলা' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি একজন ধনাঢ্য ও সমাজের বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন।

দূরে দেখা ও কাছে পড়াশুনার জন্য ঘন ঘন চশমা খোলা ও পরার সমস্যার কারণে তিনি বাইফোকাল চশমার চিন্তা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা আবিষ্কার করেন।

ট্রাইফোকাল চশমা
(Trifocal Glass)

এমন অনেক পেশার লোক আছেন যারা বাইফোকাল চশমা দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে পারেন না। বাইফোকাল চশমাতে শুধু দূরের ও খুব কাছের বস্তু দেখা যায়, কিন্তু মাঝামাঝি যেমন ২-৩ ফুট দূরের বস্তু ঝাপসা মনে হয়। ধরা যাক একজন টাইপিস্ট। তিনি যখন টাইপ করেন তখন চোখের দূরত্ব ১২-১৬ ইঞ্চি। কিন্তু যখন ম্যানুস্ক্রিপ্ট-এর দিকে তাকান (সাধারণত ২ ফুট বা এর বেশি দূরে রেখে) তখন তা ঝাপসা হয়ে যায়। কারণ এই মাঝামাঝি দূরত্বের জন্য প্রয়োজনীয় পাওয়ার তার চশমাতে নেই। চশমার দুই পাওয়ারের মাঝে যদি এই প্রয়োজনীয় পাওয়ার দেয়া যায় তাহলে সেটা হবে একটি ট্রাইফোকাল চশমা।

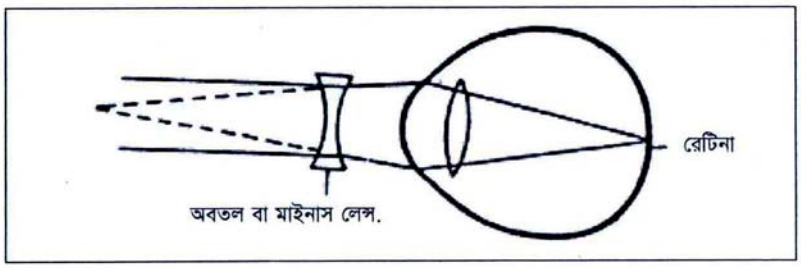

সাধারণত নিম্নোক্ত পেশাজীবীদের জন্য ট্রাইফোকাল চশমা উপযোগী।

১. টাইপিস্ট
২. লাইব্রেরিয়ান
৩. বুক কিপার
৪. সচিব— দূরে ও কাছের ফাইল দেখার জন্য
৫. গৃহকর্ত্রী (House Wife)— পড়া, সেলাই (১২-১৬ ইঞ্চি দূরে) রান্না, খাবার তৈরি (২০-২৪ ইঞ্চি দূরে) ইত্যাদির জন্য।

৬. ট্রাক বা বাস ড্রাইভার

৭. বাদক (Musicians)

এই চশমার মধ্যের সেগমেন্টে সাধারণত নিচের সেগমেন্টের এডিশন পাওয়ারের অর্ধেক পাওয়ার দেয়া হয়ে থাকে।

ট্রাইফোকাল চশমায় বাইফোকাল চশমার মতো একই ধরনের অসুবিধা হতে পারে।

ট্রাইফোকাল চশমা

মাল্টিফোকাল চশমা

(Invisible progressive power lenses, IPPL)

অদৃশ্য ক্রমবর্ধমান পাওয়ার-এর মাল্টিফোকাল চশমা এ যুগের সর্বাধুনিক চশমা— যা দিয়ে দূরের, কাছের, মধ্যবর্তী সকল দূরত্বের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায়। এই চশমার আকর্ষণ হলো লেন্সে কোনো দাগ থাকে না, যার ফলে সৌন্দর্যবর্ধক (cosmetic) হিসাবে অনেকে এই চশমা পরে থাকেন। উন্নত দেশে এই ধরনের চশমার বেশ প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে এখন মাল্টি ফোকাল চশমা পাওয়া যায়। তুলনামূলক মূল্য বেশি হলেও অনেকেই এখন এই জাতীয় চশমা ব্যবহার করে থাকেন। এই চশমাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও মাল্টিফোকাল হওয়ায় প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দূরত্বের বস্তুকে পরিষ্কার দেখা যায়।

এই অদৃশ্য ক্রমবর্ধমান পাওয়ার চশমার ইতিহাস বেশিদিনের নয়। ১৯২৪ সালে প্রথম Glancy নামক কোম্পানি দূরে, মধ্যবর্তী ও নিকটে দেখার জন্য ক্রমবর্ধমান পাওয়ার তৈরির চিন্তা করেন। পরে ১৯৪০ সালে কয়েকটি কোম্পানি এই লেন্স তৈরি করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকার লসএঞ্জেলস-এর Younger Manufacturing Company ইয়ংগার সিম্‌লেস (Younger seemless) নামে এই লেন্স তৈরি করে। ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সে ভ্যারিলাক্স (Varilux) নামে এই চশমা তৈরি হয়। এই ভ্যারিলাক্সই সবচেয়ে প্রচলিত নাম। এই চশমাকে মালটিলাক্সও (Multilux) বলা হয়। ১৯৭৬ সালে এই লেন্সের কিছু উন্নতিসাধন করা হয়, এখন তা ভ্যারিলাক্স-২ নামে বাজারে পাওয়া যায়। ভ্যারিলাক্স-২ লেন্স কাচ ও প্লাস্টিক উভয় রকমেই পাওয়া যায়।

এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি বিচ ব্লাইন্ড (Beach Blind) অমনিফোকাল (Omnifocal) আল্ট্রাভিউ (Ultravue) ইত্যাদি নামে এই ধরনের চশমা তৈরি করে থাকে।

অদৃশ্য ক্রমবর্ধমান পাওয়ার লেন্সের সুবিধা

১. লেন্সে কোনো দাগ থাকে না, সুতরাং সৌন্দর্যবর্ধক।

২. ট্রাইফোকাল চশমার মতো বিভিন্ন পেশাজীবী। যেমন— টাইপিস্ট, লাইব্রেরিয়ান, বুক কিপার, গৃহকর্ত্রীদের জন্য মধ্যবর্তী দূরত্বের বস্তু দেখার জন্য বিশেষ উপযোগী।

৩. ছানি অপারেশন-এর পর, চোখের সামঞ্জস্যকরণ (Accommodation) নেই এমন কিছু চোখের অসুখে এবং কয়েক ধরনের ট্যারা চোখের চিকিৎসাতেও এই চশমা বিশেষভাবে উপযোগী।

৪. এই চশমাতে নিকটে দেখার পাওয়ার একটু বেশি দেয়া যায়, যার ফলে প্রতি বছর চশমার পরিবর্তন না করে বরং ২/৩ বছর পর পরিবর্তন করা সম্ভব।

মাল্টিফোকাল চশমার অসুবিধা

বাইফোকালের চাইতে মাল্টিফোকাল চশমা অনেক সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক হলেও এতে বেশ কিছু অসুবিধাও হতে পারে। যেমন—

চশমার মাঝখান দিয়ে দূরে, মধ্যবর্তী ও নিকটের বস্তু পরিষ্কার দেখা গেলেও পাশ দিয়ে দৃশ্যমান বস্তু বাঁকা (distortion) দেখা যেতে পারে।

উপরের ছবিতে ক, খ ও গ স্থান দিয়ে যথাক্রমে দূরের, মধ্যবর্তী ও নিকটের বস্তু পরিষ্কার দেখা যাবে কিন্তু 'ঘ' স্থান দিয়ে কোনো বস্তুকে বাঁকা (distorted) মনে হবে।

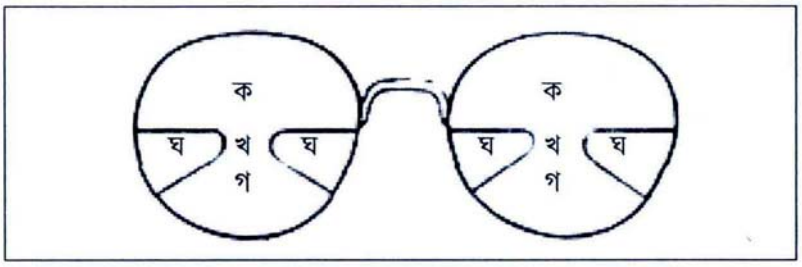

ছানি অপারেশনের পরবর্তী চশমা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত অগ্রগতি হচ্ছে- 'চোখের ছানি' অপারেশন। বর্তমানে চোখের পাশে খুব সামান্য ইনসিশন (২-৩ মি: মি:) দিয়ে ফ্যাকো মেশিনের সাহায্যে (ফ্যাকো সার্জারী) চোখের ছানি অপারেশন করা হচ্ছে। এছাড়া ৬-৭ মি:মি: ইনসিশন দিয়ে "স্মল ইনসিশন ক্যাটার‍্যাক্ট সার্জারী" বা এস. আই. সি. এস করা হচ্ছে। উভয় পদ্ধতিতেই "কৃত্রিম লেন্স সংযোজন" করা হয়। এর ফলে পূর্বের ন্যায় চোখের ছানি অপারেশন করে আর মোটা লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয় না। আধুনিক পদ্ধতিতে অপারেশন এর চশমার প্রয়োজন হতে পারে, তবে সে চশমাটি পাতলা ও স্বাভাবিক লোকের চশমার মতো। অতি সম্প্রতি উন্নত বিশ্বে মাল্টিফোকাল কৃত্রিম লেন্স সংযোজন শুরু হয়েছে। এ জাতীয় লেন্সের সাহায্যে শতকরা ৮০ জন রোগী অপারেশন এর পর কোন চশমা ছাড়াই স্বাভাবিক দেখতে পারেন। অদুর ভবিষ্যতে এই লেন্সের মূল্য কমে গেলে আমাদের দেশেও এ ধরনের মাল্টিফোকাল কৃত্রিম লেন্সের ব্যবহার হবে বলে আশা করা যায়।

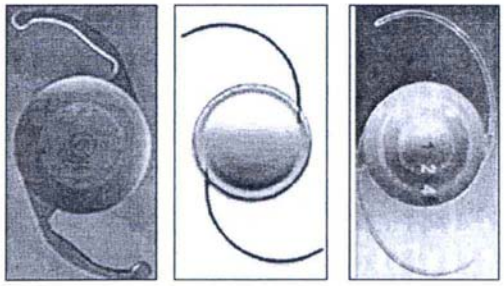

বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম লেন্স

কৃত্রিম লেন্সের সুবিধা

১. অপারেশন-এর পূর্বেই কৃত্রিম লেন্সের প্রয়োজনীয় পাওয়ার নির্ণয় করা হয়, যার ফলে অপারেশন-এর পর সাধারণত দূরে দেখার জন্য কোনো

চশমার প্রয়োজন হয় না। আর প্রয়োজন হলে খুব সামান্য পাওয়ারের পাতলা স্বাভাবিক লেন্স লাগে।

তবে নিকটে দেখার জন্য স্বাভাবিক চশমার দরকার হয়।

২. দৃশ্যমান বস্তু মাত্র ১-২% বড় দেখা যায়, যা রোগীর পক্ষে কোনোই অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

৩. পুরাতন কালের ছানির চশমার অসুবিধাসমূহের কোনোটাই এই কৃত্রিম লেন্সে হয় না।

সুতরাং বলা যায় কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে ছানি অপারেশনের পর রোগী চোখের প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পায়।

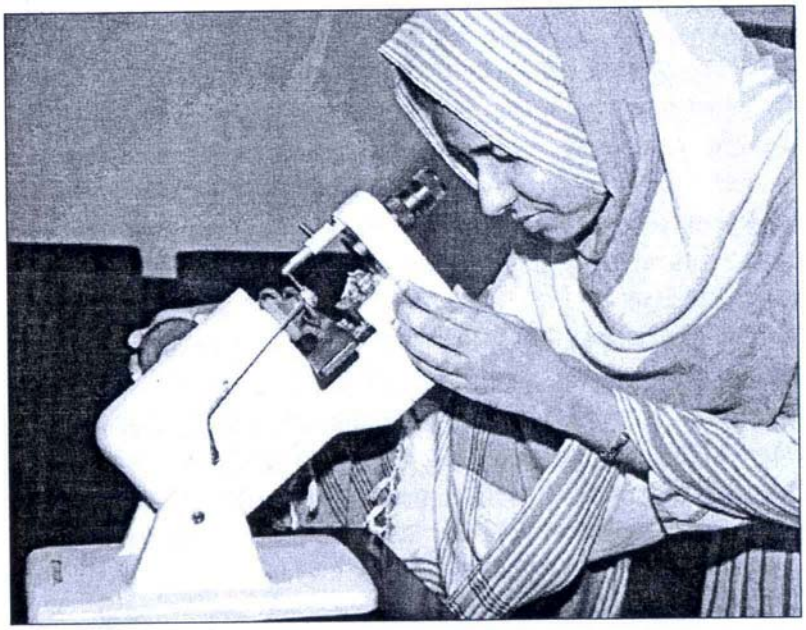

লেন্সমিটার যন্ত্রের সাহায্যে চশমার পাওয়ার পরীক্ষা করা হচ্ছে।

রোদ-চশমা বা সানগ্লাস
(Sunglass)

জীবনে কোনোদিন রোদ-চশমা বা সানগ্লাস পরেন নি এমন লোক কম আছেন। রোদের মধ্যে চলাফেরার সময় সানগ্লাস খুবই আরামদায়ক। এছাড়া চোখের বিভিন্ন রোগ যেমন— চোখ ওঠা, প্রদাহ, ছানি অপারেশন-এর পরও চোখের আলোভীতি কমাবার জন্য সানগ্লাস ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

সানগ্লাসের সাহায্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ দৃশ্যমান আলো (Visible light) কে ফিল্টার করা হয়। যার ফলে অতিরিক্ত রোদে চোখে আরাম অনুভূত হয়।

সানগ্লাস বিভিন্ন রঙের হতে পারে। যেমন বাদামি, ধূসর, গোলাপি, সবুজ, গাঢ় নীল ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পছন্দের ওপরই সাধারণত বিভিন্ন রঙের সানগ্লাস নির্বাচন করা হয়। স্বচ্ছ কাচের ওপর এসব রঙের ধোঁয়ার সাহায্যে কাচ রঙ করা হয় এবং সানগ্লাস তৈরি করা হয়। উন্নতমানের সানগ্লাস সব সময়ই গ্রাইন্ড ও পালিশ করা হয়। যার ফলে গ্লাসের ভেতর দিয়ে কোনো বস্তুকে বা রাস্তাকে আঁকা-বাঁকা মনে হয় না।

আমাদের দেশে ফুটপাতে বা অনেক জায়গায় বেশ কমদামি সানগ্লাস পাওয়া যায়। নিম্নমানের রঙিন প্লাস্টিক সিট থেকে গোল করে কেটে এর গ্লাস তৈরি করা হয়। এসব গ্লাস প্রয়োজনীয় গ্রাইন্ডিং ও পালিশ করা হয় না বলে রাস্তাকে বা দৃশ্যমান বস্তুকে আঁকা-বাঁকা মনে হতে পারে (Object distortion)। এসব সানগ্লাস অনেকক্ষণ ব্যবহার করলে মাথাব্যথা হতে পারে।

ফটোক্রমিক গ্লাস
(Photochromic glass)

তরুণ-তরুণীদের বেশি পছন্দ ফটোক্রমিক গ্লাস। কারণ, এই গ্লাসে প্রয়োজনীয় পাওয়ার ব্যবহার করে সব দেখা যায়। আবার রোদে এর রঙ পরিবর্তিত হয়ে গাঢ় হয়ে যায়— যা কিছুটা সানগ্লাসের কাজ করে।

ফটোক্রমিক গ্লাসে সিলভার হ্যালাইড মাইক্রোক্রিস্টাল থাকে যা রোদে বিভাজিত হয়ে সিলভার ও হ্যালেজেন-এ রূপান্তরিত হয়ে কাচের রঙের পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্লাসটি রোদ থেকে ছায়ায় আনলে আবার সিলভার হ্যালাইড হয়ে যায় এবং কাচ সাদা হয়ে যায়।

রোদে এই গ্লাস সানগ্লাসের মতো কাজ করলেও তা সানগ্লাসের মতো অত শক্তিশালী ফিল্টার নয়। সানগ্লাসে ৮৫% দৃশ্যমান আলো ফিল্টার হয় আর ফটোক্রমিক গ্লাসে মাত্র ১৫% আলো ফিল্টার হয়। তবুও রোদে ফটোক্রমিক গ্লাস বেশ আরামদায়ক, কিন্তু সানগ্লাসের বিকল্প নয়। বাণিজ্যিকভাবে এসব গ্লাসকে ফটো-গ্রে, ফটো ব্রাউন, বা ভ্যারিগ্রে ইত্যাদি বলা হয়।

আমেরিকান কর্নিং গ্লাস কোম্পানি এক ধরনের ফটোক্রমিক লেন্স তৈরি করেছে যা রোদে গেলে পূর্ণ সানগ্লাসের মতো হয়ে যায় কিন্তু ছায়াতে সামান্য রঙিন মনে হয়। বাণিজ্যিকভাবে এসব গ্লাসকে ফটোসান গ্রে, ফটোসান ব্রাউন ইত্যাদি নামকরণ করা হয়।

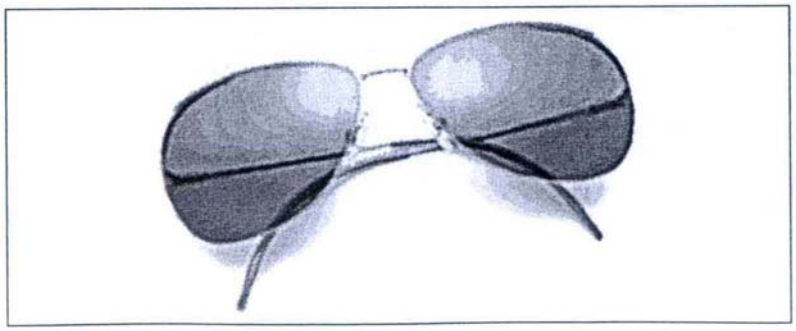

রাতে গাড়ি চালাবার চশমা

অনেকে চশমা পরে রাতে গাড়ি চালানোর সময় রাস্তার একটি বাতিকে দুটি বা তিনটি দেখে থাকেন। সাধারণত অল্প পাওয়ারের চশমা পরা থাকলে এরকম হতে পারে। আলোর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Internal reflection) -এর কারণেই এই অসুবিধা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ গাড়িচালক তেমন কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। যাদের অসুবিধা হয় তাদের চশমায় এন্টি-রিফ্লেকশন কোটিং (Antireflection coating) করা হলে আর অসুবিধা হয় না। লেন্স তৈরি হবার পর ম্যাগনেশিয়াম ফ্লোরাইড-এর ধোঁয়া লেন্সে লাগালে তা স্থায়ী এন্টি রিফ্লেকশন কোটিং হয়ে যায়। ক্যামেরা ও অন্যান্য চোখের কাজে ব্যবহৃত লেন্সে এন্টি রিফ্লেকশন কোটিং করা থাকে যাতে আলোর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে না পারে। বর্তমানে বাজারে 'A.R. Plastic' বা Anti-Reflection Plastic-লেন্স পাওয়া যায়। এ ধরনের লেন্সে আলোর প্রতিফলন কম হওয়ায়-গাড়ি চালনায় এবং কম্পিউটারে কাজ করা আরামদায়ক।

আয়না-চশমা

এটি একটি বিশেষ ধরনের চশমা। যা দিয়ে এ চশমা পরিহিত ব্যক্তি সব পরিষ্কার দেখতে পারবেন কিন্তু বাইরে থেকে তার চোখ দেখা যাবে না। সাদা বা রঙিন লেন্সে এই আয়নায় কোটিং দেয়া যায়।

ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী চেহারার বিকৃতি ঘটলে, চোখ তুলে ফেললে বা কোনো কারণে রোগী তার চোখ ও ওপরের মুখ দেখাতে না চাইলে এই ধরনের আয়না চশমা খুবই উপযোগী।

রোগীর ইচ্ছানুযায়ী সানগ্লাসের মতো তার লেন্সে কোনো রঙ করিয়ে নিতে পারেন।

চশমার পরিবর্তে ল্যাসিক সার্জারী

যাদের চোখের পাওয়ার আছে- কিন্তু চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স পরতে চান না- তাদের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার নাম-ল্যাসিক সার্জারী। ল্যাসিক ইংরেজি Laser Assisted In-situ Keratomileusis এর সংক্ষিপ্ত নাম। LASIK চিকিৎসায় এক্সাইমার (Excimier) লেজার রশ্মির সাহায্যে চোখের কর্ণিয়ার আকৃতির বা গঠনের পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ চোখের পাওয়ারের পরিবর্তন করা হয়। ল্যাসিক পদ্ধতির অপারেশন এর প্রকারভেদের মাধ্যমে মাইনাস বা প্লাস পাওয়ারকে পরিবর্তন করে বিনা পাওয়ার বা জিরো পাওয়ার করা হয়।

কাদের চোখে ল্যাসিক করা যায় ?

১। নিকট দৃষ্টি মায়োপিয়া (-২.০০ থেকে -২০.০০ ডায়াপ্টার পর্যন্ত)
২। দূরদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রপিয়া (+২.০০ থেকে +৮.০০ ডায়াপ্টার পর্যন্ত)
৩। অ্যাসটিগম্যাটিজম (১.০০ ডায়াপ্টার থেকে ৭ ডায়াপ্টার পর্যন্ত)
৪। সাধারণত ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সের পরে।

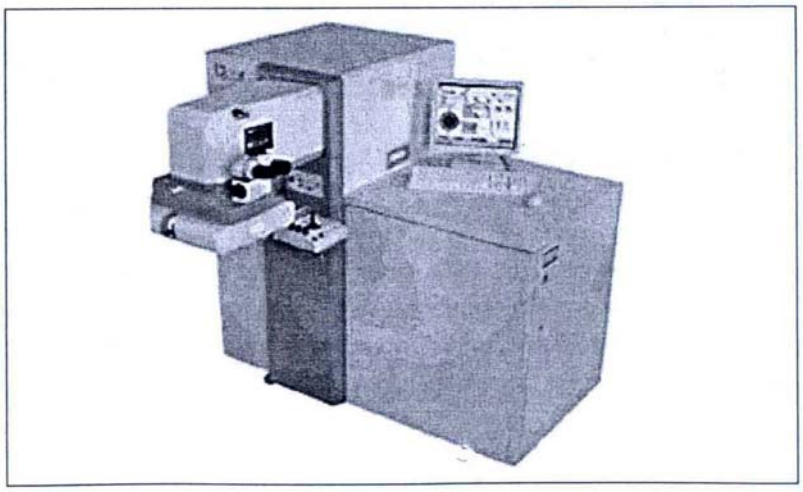

ল্যাসিক অপারেশন

- চোখের ফোঁটা ওষুধ (Eye drop) দিয়ে কর্ণিয়াকে অবশ করা হয় এবং এক্সাইমার লেজার রশ্মির সাহায্যে এর আকৃতির পরিবর্তন করা হয়।
- রোগীর চোখ লেজার দেয়ার সময় অবশ করা হয় বলে কোনো ব্যথা পান না।
- এই অপারেশন একটি মাইক্রোসার্জারী। সুতরাং রোগীকে টেবিলে শোয়ানো হয় এবং চোখের উপরে অপারেশন মাইক্রোস্কোপ এনে-ফোকাস করা হয়।
- মাইক্রোকেরাটোম এর সাহায্যে, কর্ণিয়ার একটি লেয়ার তৈরি করে তা উল্টিয়ে রাখা হয় এবং চোখের কর্ণিয়ার উপরে ১৫-৬০ সেকেন্ড লেজার দেয়া হয়। কতটুকু লেজার প্রয়োজন হবে তা ঐ চোখের পাওয়ার পরিবর্তন এর উপর নির্ভর করে যা কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব করেই দেয়া হয়। এরপর কর্ণিয়ার ঐ পাতলা লেয়ারটি পূর্বের স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়।
- লেজার দেবার পর রোগী ১৫-৩০ মিনিট হাসপাতালে অবস্থান করে বাড়ি চলে যেতে পারেন।

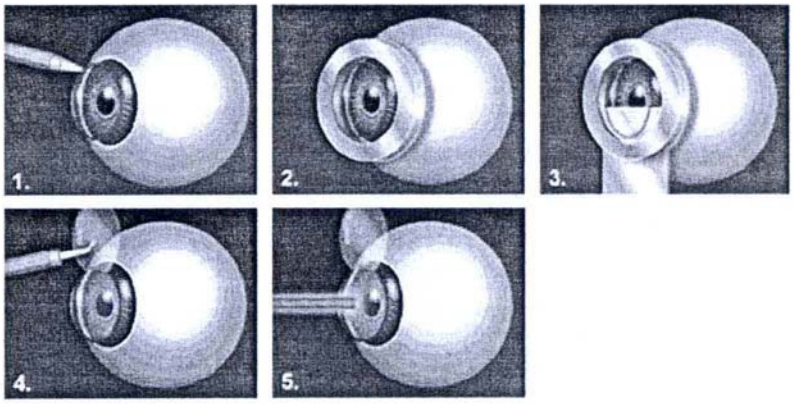

ল্যাসিক এর জটিলতা

ল্যাসিক সার্জারী-যথেষ্ট নিরাপদ একটি ব্যবস্থা। এই অপারেশন এর ফলাফল শতকরা ৯৯ ভাগই সফল। যেহেতু এটি একটি অপারেশন, সেজন্যে কারো কারো ক্ষেত্রে সামান্য অপারেশন জনিত জটিলতা হতে পারে। অভিজ্ঞ ল্যাসিক সার্জন-এর হাতে এ জটিলতাও খুব কম। অনেক রোগী-অপারেশন এর সময় ও পরে ২/৩ ঘণ্টা চোখে সামান্য ব্যথা ও চাপ অনুভব করেন। সাধারণত ১ দিন পরই এ সকল উপসর্গ ভালো হয়ে যায়। চোখে অন্ধত্ব হয়ে যাবার মতো জটিলতা এই সার্জারীতে হয় না বললেই চলে।

ল্যাসিক এর কতদিন পর সম্পূর্ণ ভালো দেখা যায় ?

ল্যাসিক এর পরপরই রোগী বেশ ভালো দেখতে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ ভালো হতে অনেকের প্রায় এক মাস সময় লাগতে পারে।

অপারেশন-এর পর ল্যাসিক বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকবার রোগীকে পুনঃপরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে ওষুধ এবং সামান্য পাওয়ারের চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স দিতে পারেন।

কাদের চোখে ল্যাসিক করা উচিত নয়

- সাধারণত ১৮ বছর বয়সের পূর্বে। কারণ এই বয়সের পূর্বে চোখের পাওয়ার এর দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে।
- যাদের চোখের পাওয়ার প্রতি বছরই অতিমাত্রায় পরিবর্তন হচেচ্ছ বা স্থিতিশীল হচ্ছে না।
- গর্ভবর্তী মহিলা (লেজার রশ্মি দ্বারা ভ্রূণের ক্ষতি এড়ানোর জন্য।)
- চোখের কোনো অসুখ যেমন- গ্লকোমা, ছানি, ভাইরাসজনিত চোখের রোগ থাকলে-ল্যাসিক করা উচিত নয়।
- শারীরিক কিছু রোগ যেমন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এস.এল.ই ইত্যদি থাকলে ল্যাসিক করা উচিত নয়।

চশমা ও গ্লাসের যত্ন

সঠিকভাবে চশমা ও এর কাচের যত্ন না করলে অল্পদিনে ফ্রেম নষ্ট হয়ে যায়, কাচ ভেঙে যেতে পারে বা কাচে দাগ হয়ে তার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার না-ও দেখা যেতে পারে। চশমা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিচের নিয়মগুলি অনুসরণ করা উচিত।

১. চশমার ফ্রেম পরিষ্কার রাখতে হবে। অল্প গরম পানিতে মাঝে-মধ্যে ধুয়ে এর ময়লা আঠা পরিষ্কার করা যায়।

২. চশমার কাচও একইভাবে পরিষ্কার করা যায়। অনেক চশমার দোকানে পরিষ্কার করার সল্যুশন পাওয়া যায়।

৩. ব্যবহার না করার সময় চশমা এর বাক্সে বা খাপে ঢুকিয়ে রাখা উচিত। অথবা ফ্রেমের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু কাচের দিক নিচে রাখা ঠিক নয়।

৪. চশমা খোলবার সময়, সবসময়ই দুই হাত দিয়ে ফ্রেমের জয়েন্টের কাছে ধরে খুলতে হবে। এক হাতে খুলতে গেলে ফ্রেম বেঁকে যেতে পারে, এমনকি ভেঙে যেতে পারে।

৫. শীতকালে অনেকসময় কুয়াশাতে চশমার কাচ ঘোলা হয়ে যায়। বাজারে ডিফগিং (defogging) সল্যুশন পাওয়া যায় যা দিয়ে কাচ পরিষ্কার করলে আর ঘোলা হয় না।

কন্টাক্ট লেন্স
(Contact Lens)

কন্টাক্ট লেন্স প্লাস্টিকের তৈরি ছোট ও পাতলা লেন্স। চোখের প্রয়োজনীয় পাওয়ার সহ এই লেন্স কর্নিয়ার ওপর লাগানো থাকে। চশমার পরিবর্তে অনেক সময় এই কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়। এই লেন্সটি কর্নিয়ার ওপরে লাগানো থাকলেও কর্নিয়ার ওপরে চোখের পানি থাকে বলে লেন্সটি কর্নিয়াকে সরাসরি স্পর্শ করে না। সুতরাং ঠিকমতো লেন্সটি ফিট করা হলে সাধারণত তা কর্নিয়ার কোনো ক্ষতি করে না।

প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়। যেমন—

১. শক্ত কন্টাক্ট লেন্স

২. আরজিপি শক্ত কন্টাক্ট লেন্স

৩. নরম কন্টাক্ট লেন্স

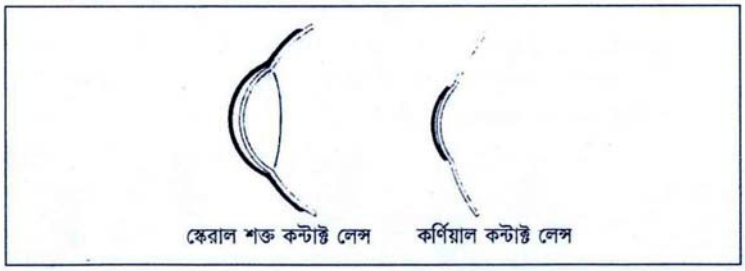

১. শক্ত কন্টাক্ট লেন্স (Hard Contact Lens) : সাধারণত ১৪ ঘণ্টার বেশি একনাগাড়ে চোখে রাখা যায় না। পিএমএমএ নামক প্লাস্টিক দিয়ে এই লেন্স তৈরি। একটি কর্নিয়াল ও অপরটি স্কেরাল শক্ত কন্টাক্ট লেন্স।

এই লেন্সের ভেতর দিয়ে কর্নিয়াতে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না, সেজন্য এটি খুব আরামদায়ক নয়। এই লেন্সটি চোখের পাওয়ারের জন্য আজকাল ব্যবহার করা হয় না।

২. আরজিপি শক্ত কন্টাক্ট লেন্স (Rigid gas permeable, RGP Contact Lens) : প্লাস্টিকের (Cellulose Acetate Butyrate, CAB) তৈরি এই লেন্সের ভেতর দিয়ে অক্সিজেন কর্নিয়াতে পৌছাতে পারে, যার ফলে আরামে সারাদিন পরে থাকা যায় ও রাতে ঘুমের আগে খুলে রাখতে হয়।

৩. নরম কন্টাক্ট লেন্স (Soft contact Lens) : এটিও প্লাস্টিকের তৈরি। খুব নরম। ভাঁজ করা সম্ভব, সহজে ভাঙে না। এর মধ্য দিয়ে অক্সিজেন কর্নিয়াতে প্রবেশ করতে পারে। সহজে অভ্যাস করা সম্ভব। একনাগাড়ে ১৮ ঘণ্টা থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী নরম কন্টাক্ট লেন্স পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই লেন্সের ব্যবহার বেশি। উন্নত দেশেও নরম কন্টাক্ট লেন্স বেশি ব্যবহৃত হয়। খেলোয়াড়দের জন্য এই লেন্স খুবই উপযোগী।

কন্টাক্ট লেন্সের ব্যবহার

১. যাদের এক চোখের তুলনায় অন্য চোখের পাওয়ারের অনেক পার্থক্য— যেমন ধরুন, কারো এক চোখের পাওয়ার স্বাভাবিক, অন্য চোখে মাইনাস পাঁচ। তিনি সাধারণ চশমা দিয়ে দুই চোখে এক সঙ্গে দেখতে পারবেন না। কিন্তু কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে একই সঙ্গে দুই চোখে দেখা যাবে।

২. এক চোখে ছানি অপারেশন-এর পর অনেক সময় দেখা যায় এক চোখে ছানি অপারেশন হয়েছে কিন্তু কৃত্তিম লেন্স বসানো যায় নি এবং অন্য চোখে প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টি আছে। তখন ছানি অপারেশন পরবর্তী মোটা চশমা দিলে তিনি একই জিনিস দুটি দেখবেন (diplopia)। সুতরাং অপারেশন করলেও সেই চোখে চশমার পাওয়ার দেয়া যায় না। কিন্তু কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে একই সঙ্গে দুই চোখে দেখা যাবে। শিশুদের আঘাতজনিত কারণে এক চোখে ছানি পড়ে গেলে অপারেশনের পরে কন্টাক্ট লেন্সই একমাত্র চিকিৎসা।

৩. যারা বেশি প্লাস বা মাইনাস পাওয়ারের চশমা পরেন।

৪. চিকিৎসা হিসেবে— যেমন চোখের আঘাতের পর, অ্যাসিড বা অ্যালকালি দিয়ে চোখ পুড়ে গেলে, পাপড়ি বেঁকে গিয়ে কর্নিয়াতে স্পর্শ করতে থাকলে, কর্নিয়ার প্রদাহে ইত্যাদি অনেক অসুখে বিভিন্ন প্রকার কন্টাক্ট লেন্স সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৫. কর্নিয়াতে কোনো দাগ থাকলে বা চোখের কোনো ত্রুটি ঢাকার জন্য এবং অনেক সময় সৌন্দর্য বর্ধক হিসেবেও কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়।

কাদের কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা উচিত নয়

১. চোখের অ্যালার্জি থাকলে

২. বেশি ধুলাবালির মধ্যে যাদের কাজ করতে হয়

৩. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি

৪. চোখের যত্ন সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তি

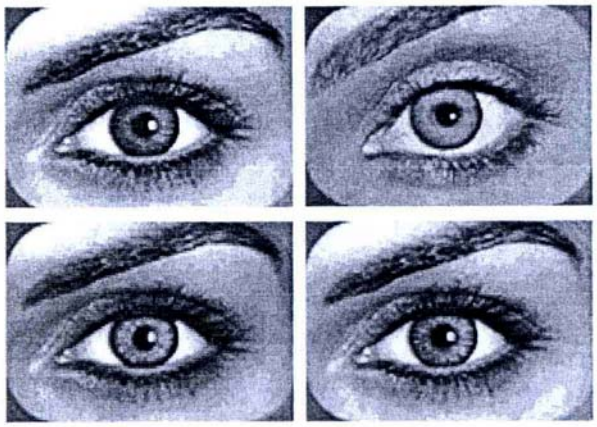

কন্টাক্ট লেন্সের যত্ন

প্রথমে কন্টাক্ট লেন্স নেবার সময় বিশেষজ্ঞগণ যেভাবে লেন্সটি চোখে পরা ও খোলার নিয়ম শিখিয়ে দেন সেভাবেই তা করতে হবে। সব সময়ই পরিষ্কার হাতে লেন্স ধরতে হবে। ময়লা হাতে লেন্স ধরলে চোখে জীবাণু সংক্রমিত হয়ে কর্নিয়ার ক্ষত তৈরি করতে পারে। লেন্স রাতে খুলে বিশেষ দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সকালে পরিষ্কার হাতে চোখে পরতে হবে। চোখে কখনো ঘোলা দেখা গেলে বা চোখ লাল ও জ্বালা-যন্ত্রণা হলে কন্টাক্ট লেন্স পরা বন্ধ রাখতে হবে দ্রুত কন্টাক্ট লেন্স বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

চশমার কাচ
(Spectacle lens)

বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড ও সিলিকেটের মিশ্রণে কাচ (glass) তৈরি হয়ে থাকে। যদিও প্রায় ৮০ প্রকার কাচ দিয়ে চশমা তৈরি করা যেতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ক্রাউন কাচ। চশমার কাচ তৈরি বেশ জটিল ব্যাপার। কাচের মধ্যে সমরূপতা (homogenecity), কোনো দাগ (Striae) বুদবুদ (bubbles) ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকা দরকার, সেজন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে চশমার কাচ তৈরির প্রয়োজন হয়।

কাচ তৈরির জন্য যেসব উপাদান (Ingredients) ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে লোহাহীন বালু এবং এর সঙ্গে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিসা, অ্যালুমিনিয়াম, ব্যারিয়াম ইত্যাদি ধাতুর পালভেরাইজড অক্সাইড।

এসব উপাদন একটি বিশেষ পাত্রে প্রায় ৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জ্বালানো হয়। এতে সকল উপাদান গলে যায়। এভাবে ২/৩ দিন রাখা হয় এবং সবসময়ই উপাদানগুলিকে নাড়ানোর ব্যবস্থা থাকে যাতে তৈরি কাচে কোনো বুদবুদ না থাকে। এরপর তৈরি তরলকে ঠাণ্ডা করলে বিভিন্ন পাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের পাতলা বা মোটা ইত্যাদি কাচে পরিণত হয়।

এই কাচকে বিভিন্ন আকারে কাটা হয় যার নাম ব্লাংক। ব্লাংক থেকেই চশমা প্রস্তুতকারীগণ বিভিন্ন পাওয়ারের চশমা তৈরি করে থাকেন।

প্রস্তুতকারকগণ ব্লাংক'কে গ্রাইন্ডিং, সারফেসিং ও পলিশিং ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় চশমার আনকাট লেন্স (Uncut lens) তৈরি করেন। পরে তা ফ্রেমের আকার অনুযায়ী কেটে ফ্রেমে ফিট করে দিলে চশমা হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি।

১. ক্রাউন কাচ (Crown glass) : সাধারণত পরিষ্কার ক্রাউন কাচ (Crown glass) দিয়ে চশমার কাচ তৈরি করা হয়ে থাকে। যার রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স (Refractive Index) ১.৫২৩।

২. ফ্লিন্ট কাচ (Flint glass) : ক্রাউন কাচের মধ্যে সিসা (lead) মিশিয়ে এই কাচ তৈরি করা হয়। এই কাচের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স ১.৬৯। এর রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বেশি হওয়ায় এই কাচ দিয়ে বেশি পাওয়ারের চশমা, বাইফোকাল ও

অ্যাক্রম্যাটিক লেন্স তৈরি করা হয়। ফ্লিন্ট কাচে ম্যাগনেসিয়াম ফ্লোরাইড (Magnesium fluoride)-এর প্রলেপ থাকলে ঐ কাচের উপরে আলোর প্রতিফলন কমে যায়, ফলে চশমা আরামদায়ক হয়।

৩. সানগ্লাস (Sunglass) : সানগ্লাস বা গগলস-এ লেন্সের ওপর রঙ করা থাকে যা আলোর সঞ্চালন (Light transmission) কমিয়ে দেয় এবং আলোর ঝলসানি (glare) থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৪. প্লাস্টিক লেন্স (Plastic lens) : কাচের লেন্স ভেঙে গেলে টুকরা চোখে লেগে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে— এটা চিন্তা করেই ১৯৩৫ সালে পারসপেক্স (Perspex) নামক প্লাসটিক লেন্সের উৎপত্তি হয়। একরাইলিক অ্যাসিড থেকে তৈরি মিথাইল মেথএকরাইলেট নামক প্লাস্টিক দিয়ে এই পারসপেক্স তৈরি করা হয়। এর রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স ১.৪৯৫। প্লাস্টিক লেন্সের সুবিধা—

১. খুব হালকা, বেশি পাওয়ারের চশমার জন্য খুব উপযোগী।

২. কাচের চাইতে বেশি স্বচ্ছ।

৩. সহজে ভাঙে না, আর ভাঙলেও বড় বড় আকারের টুকরা হয়। টুকরার প্রান্ত ভোঁতা হয় যা সহজে চোখের ক্ষতি করে না।

৪. কন্টাক্ট লেন্স তৈরি করা যায়।

পারসপেক্স-এর তৈরি প্লাস্টিক লেন্সের কয়েকটি অসুবিধাও রয়েছে যেমন— সহজে লেন্সে দাগ পড়ে যায় ও খুব গরমে নষ্ট হয়ে যায়। এই অসুবিধা বিবেচনা করে বর্তমানে শক্ত রেসিন অ্যালাইল ডাইগ্লাইকল কার্বোনেট দিয়ে প্লাস্টিক লেন্স তৈরি করা হয়। এই ধরনের প্লাস্টিক লেন্সে বিভিন্ন রঙ করা যায়, যার ফলে আলোর সঞ্চালন কম হয় ও চোখ ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া লেন্সের ওপরে কোটিং করা হলে তা আলোর প্রতিফলন কমিয়ে দেয়। তাপমাত্রার পরিবর্তন যেমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বাইরে গরমে গেলে কাচের চশমা ঝাপসা হয়ে যায়, কিন্তু প্লাস্টিকের চশমায় তা হয় না।

প্লাস্টিকের লেন্স বানানো তুলনায় সহজ। একটি পারসপেক্স-এর সিটকে গোল করে কেটে তা প্রয়োজনীয়ভাবে বাঁকা (curve) করে ব্ল্যাংক তৈরি করা হয়।

চশমার নিরাপদ কাচ (Safety lenses)

চশমার কাচ ভেঙে গেলে টুকরাগুলো ধারালো হয়ে তা চোখের ক্ষত করতে পারে। শিশুদের, খেলোয়াড়দের ও কল-কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই কাচ ভেঙে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

কিন্তু যেসব চশমার কাচ ভেঙে গেলে ভোঁতা, ধারহীন বড় বড় টুকরা হয় তাকেই বলা হয় নিরাপদ কাচ বা সেফটি লেন্স। এই কাচ ভেঙে গেলে দূরে ছিটকে

পড়ে না, সুতরাং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেক কম। নিরাপদ কাচ কয়েক প্রকার পাওয়া যায় যেমন—

১. **প্লাস্টিক লেন্স (Plastic hard resin lens) :** আধুনিক শক্ত রেসিনের তৈরি প্লাস্টিক লেন্স একটি নিরাপদ লেন্স।

২. **তাপ প্রদত্ত শক্ত কাচের লেন্স (heat treated hardened glass lens) :** বিশেষ ভাবে তৈরি এই লেন্স কমপক্ষে ২-৩ মিলিমিটার পুরু হয়। শিশুদের ও খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ উপযোগী।

৩. **ল্যামিনেটেড লেন্স (Laminated lens) :** কাচ ও প্লাস্টিকের মিশ্রণে তৈরি হয়।

৪. **ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্ট লেন্স (Impact rasistant lens) :** কাচের লেন্স তৈরি করার পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য পটাসিয়াম দ্রবণে ১৮ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে তা দিয়ে নিরাপদ লেন্স তৈরি হয়।

৫. **নরম কন্টাক্ট লেন্স।**

চশমার ফ্রেম

ফ্রেম নির্বাচন

যদিও চশমার ফ্রেম নির্বাচন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখলে তা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে। যেমন—

১. সৌন্দর্য বৃদ্ধির চাইতে সঠিকভাবে দেখার জন্যই সাধারণত চশমা নেয়া হয়।

২. মুখমণ্ডলের কোনো অসমতা থাকলে সেই অনুযায়ী ফ্রেম নির্বাচন করা দরকার।

৩. ফ্রেম যাতে রুচিজ্ঞান সম্পন্ন ও সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন হয়।

৪. ফ্রেম হতে হবে শক্ত, দৃঢ়, হালকা এবং সহজে ও হালকাভাবে ফিট করবে অথচ যা চামড়ার কোনো ক্ষতি করবে না।

৫. দূরে দেখার চশমায় চোখ ও চশমার লেন্স সমান্তরাল থাকা প্রয়োজন। তবে লম্বা ব্যক্তিদের লেন্স একটু নিচের দিকে বাঁকালে তাদের দেখতে সুবিধে হয়।

৬. কাছে দেখার জন্য ছোট আকারের ফ্রেমই সুবিধাজনক।

৭. ফ্রেমটি চোখের সামনে এমনভাবে বসবে যাতে লেন্সের সেন্টার ঠিক চোখের পিউপিলের বরাবরে থাকে এবং চোখের কর্নিয়া থেকে লেন্সের দূরত্ব সব সময় যেন একই থাকে (সাধারণত ১২ মিলিমিটার থাকে)। লেন্স সামনে বা পেছনে সরে গেলে দৃষ্টিরও পরিবর্তন হয়ে যায়।

চশমার ফ্রেম কী দিয়ে তৈরি

চশমার ফ্রেম সাধারণত মেটাল (Metal), কচ্ছপের খোলস (Tortoise shell), প্লাস্টিক (Plastic) বা এসবের মিশ্রণে তৈরি করা হয়। মেটালিক ফ্রেম আবার ইস্পাত (Stainless steel), সোনা (gold), সোনার প্রলেপ (gold plated), অ্যালুমিনিয়াম (Anodized Aluminium) এবং নিকেল ইত্যাদি মেটাল দিয়ে তৈরি হতে পারে।

কচ্ছপের খোলসের তৈরি ফ্রেম খুবই আকর্ষণীয়, টেকসই হয় ও বাঁকানো যায়।

প্লাস্টিক ফ্রেম

প্লাস্টিক ফ্রেম পাঁচ ধরনের প্লাস্টিক থেকে তৈরি হতে পারে।

১. **সেলুলোজ নাইট্রেট / সেলুলয়েড বা জাইলোনাইট (Cellulose nytrate) :** এই প্লাস্টিকের তৈরি ফ্রেম শক্ত ও দৃঢ় হয়, কিন্তু অনেক সময় চামড়ায় প্রদাহ সৃষ্টি করে, ফলে এর ব্যবহার কম। উন্নত অনেক দেশে এই প্লাস্টিক ব্যবহারে আইনগত নিষেধ আছে। এই ফ্রেমে আগুন লাগলে তা জ্বলতে থাকে। পুরনো হলে এই ফ্রেমের রঙ নষ্ট হয়ে যায়।

২. **সেলুলোজ এসিটেট (Cellulose acetate) :** সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ফ্রেম এই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়। এই ফ্রেমে আগুন ধরালে তা জ্বলতে থাকে না। আগুন সরালে আপনাতেই নিভে যায়। এই ফ্রেমের রঙ নষ্ট হয় না।

৩. **লিউসাইট (lucit, Plexiglass, perspex) :** অত্যন্ত শক্ত প্লাস্টিক। এর রঙও পরিবর্তন হয় না।

৪. **নাইলন (Nylon) :** তৈরি করার পর এই ফ্রেমে রঙ করা হয়। পুরনো হলে সহজে ভেঙে যায়।

৫. **অপটাইল (Optyl) :** বর্তমানে ব্যবহৃত সবচাইতে উন্নতমানের প্লাস্টিক। ১৯৬৮ সালে এপক্সি রেসিন, (Epoxy resin) দিয়ে অস্ট্রিয়াতে অপটাইল তৈরি করা হয়। ৮০-১০০° সেঃ তাপে অপটাইল নরম করা যায় এবং ফ্রেম তৈরির পর বিভিন্ন রঙ ও শেড দেয়া যায়, ফলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ডিজাইন ও রঙে অপটাইল ফ্রেম পাওয়া যায়। এটি সেলুলোজ এসিটেট বা নাইট্রেট প্লাস্টিকের চাইতে শতকরা ৩০ ভাগ ওজনে কম।

ফ্রেমের অংশ

১. **রিম :** যার সঙ্গে লেন্সটিকে ফিট করা হয়।

২. **ব্রিজ (Bridge) :** ফ্রেমের যে অংশটি নাকের ওপর ও দুই পাশে থাকে। সাধারণত ব্রিজে প্যাড লাগানো থাকে, যাতে নাকের ওপর বেশি চাপ না পড়ে।

৩. **সাইড পিস বা টেম্পল :** রিমের সঙ্গে যে অংশ কানের পেছনে সংযোগ করে।

৪. **জয়েন্ট :** ফ্রেমের বিভিন্ন অংশ জয়েন্টের মাধ্যমে জোড়া দেয়া থাকে। অনেক ফ্রেমে এই জোড়া লুকানো থাকে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

ফ্রেমের মাপ

ভালো ফ্রেমের টেম্পল-এ কয়েকটি সংখ্যা লেখা থাকে। এটা হলো ফ্রেমের রিম বা আইপিস ও ব্রিজের মাপ। যেমন— ৬০× ১৩ লেখা থাকলে রিমের পাশাপাশি মাপ ৬০ মিলিমিটার ও ব্রিজের মাপ ১৩ মিলিমিটার।

উপরের ছবিতে ফ্রেমের মাপ দেখানো হয়েছে। এখানে ক হলো রিমের মাপ এবং খ হলো ব্রিজের মাপ। গ–ঘ লাইনটি একটি কাল্পনিক লাইন যা লেন্সের ঠিক

কেন্দ্র দিয়ে যায়। এই লাইনের নাম ডেটাম লাইন (Datum line)। এই লাইনের সাহায্যে অপটিসিয়ানগন লেন্সের কেন্দ্র ও অন্যান্য মাপ নিয়ে থাকেন। এছাড়াও মুখের লম্বা-চওড়া অনুযায়ী টেম্বল-এর মাপ নেয়া হয়।

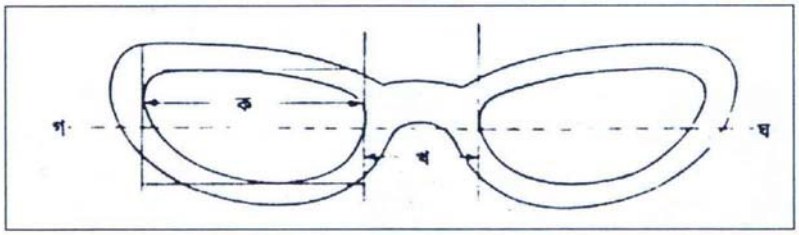

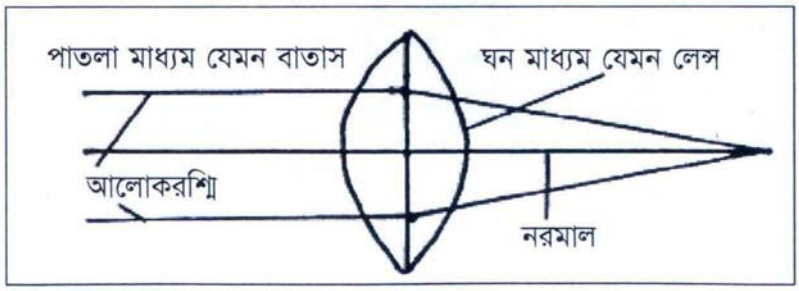

পিডি (PD—Pupillary Distance)

আরামদায়ক চশমার জন্য চোখের পিডি মাপা খুবই জরুরি। দুটি চোখের দুটি পিউপিলের দূরত্বকেই পিডি বলা হয়। আমাদের দেখার সময় আলো পিউপিল দিয়ে চোখে প্রবেশ করে। সুতরাং চশমার লেন্সের কেন্দ্র ঠিক পিউপিল বরাবর তৈরি করতে হয়। দুটি লেন্সের কেন্দ্রের দূরত্ব যদি পিডি-এর বেশি বা কম হয় তাহলে প্রিজম্যাটিক ইফেক্ট হয়ে চোখে ঝাপসা দেখা যাবে ও চশমা আরামদায়ক হবে না।

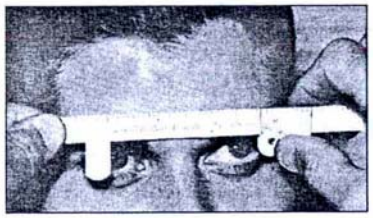

দূরে ও কাছে দেখার জন্য ভিজ্যুয়াল এক্সিজ (visual axis)-এর ২ থেকে ৫ মিলিমিটার পার্থক্য হতে পারে। সুতরাং বাইফোকাল চশমা দেবার সময় দূরের ও কাছের পিডি নির্ণয় করতে হয়। বয়স ও মুখের আয়তন অনুসারে দূরের পিডি

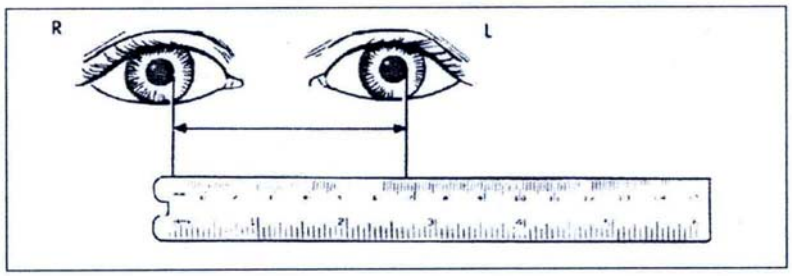

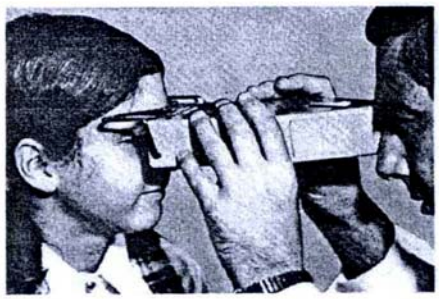

সাধারণত ৫০ থেকে ৭৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পিডি মাপার জন্য পিডি স্কেল, পিউপিউলারি গজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক অটোরিফ্র্যাকটোমিটার (Autorefractometer)-এ চোখের পাওয়ারের সঙ্গে পিডিও মাপা যায়।

চশমায় অ্যালার্জি ও চর্মপ্রদাহ

অনেক লোকেরই চশমার ফ্রেম ব্যবহারের ফলে চামড়ার অ্যালার্জি (contact dematitis) হতে দেখা যায়।

ফ্রেম যে সকল স্থানে চামড়ার সংস্পর্শে আসে যেমন নাকের ওপর ও দুই প্রান্ত, চিবুকে ও কানের পেছনে এই প্রদাহ হতে পারে। যদিও সাধারণ একটা ধারণা আছে চশমার ফ্রেমে অ্যালার্জি হয়, কিন্তু এটা স্বাভাবিক চর্মের প্রদাহও হতে পারে। ফ্রেমের দিনরাত ঘর্ষণের ফলে বা পুরাতন ফ্রেমের টেম্পলের পেছন দিকে অমসৃণ (rough) বা কোনো কোনো স্থানে ময়লা লেগে থেকেও এই ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

সাধারণত জাইলোনাইট দিয়ে তৈরি প্লাস্টিকের ফ্রেম ও নিকেলের ফ্রেম ব্যবহার বেশি অ্যালার্জিক প্রদাহ হতে পারে। যদিও নিকেলের ফ্রেম ২/১ দিন ব্যবহার করলেই অ্যালার্জি হয় না। বারবার ব্যবহার করার ফলে নিকেলের সঙ্গে চামড়ার কোষের প্রতিক্রিয়া হয়ে এই প্রদাহ হতে পারে।

চশমার সাহায্যে অন্ধত্ব প্রতিরোধ

লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করা এবং প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চশমার গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নত দেশসমূহে রোগীরা সঠিক সময়ে চক্ষু চিকিৎসকের কিংবা রিফ্র্যাকশনিস্ট (যারা চোখের পাওয়ার নির্ণয়ে এবং তার ব্যবস্থাপত্র দিতে অভিজ্ঞ) এর পরামর্শ নিতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে চশমাও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে এর সুযোগ খুবই কম। চিকিৎসা এবং চশমা দুটিই আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। আর সেজন্য সময়মতো চোখের পরীক্ষা ও চশমার ব্যবহার অনেক কম।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্ধত্ব প্রতিরোধ করার একটি উপায় হিসাবে স্বল্পমূল্যে চশমা সরবরাহ করার জন্য সদস্য দেশগুলিকে পরামর্শ দিয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চোখের পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে চশমা দেয়া হলে অনেক শিশুর দৃষ্টিশক্তির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে। ছানি অপারেশন-এর পর বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চশমা সরবরাহ করা গেলেও অনেক গরিব রোগী চোখে দেখতে পারবে ও স্বাধীনভাবে তার দৈনন্দিক কাজ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে অন্যান্য ছানি রোগীদেরকে অপারেশন করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সহজ হবে। এভাবে বাংলাদেশের অন্ধত্বের প্রথম ও প্রধান কারণ চোখের ছানি রোগের সঠিক চিকিৎসা সহজতর হবে।

অন্ধত্ব প্রতিরোধে চশমার ব্যবহার বাড়াবার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে। যেমন—

১. চশমার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা।
২. বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চশমার ফ্রেম ও লেন্স সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে প্রতিটি শিশুর চোখের পরীক্ষা করানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চশমার ব্যবস্থাপত্র দেয়া।
৪. চশমা ব্যবহার করলে চোখ খারাপ হয়ে যায় বা চোখের পাওয়ার বেড়ে যায় এসব কুসংস্কার দূর করতে হবে।
৫. থানা পর্যায়ে বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষার কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। মাসে অন্তত একবার চক্ষু চিকিৎসককে জেলা সদর থেকে থানা কেন্দ্রে পাঠিয়ে সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম

কম্পিউটার বা কম্পিউটারের মতো এমন যন্ত্রপাতিতে নিয়মিত ও অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে চোখের নানা সমস্যা ও উপসর্গ দেখা দিতে পারে-এই অবস্থাকে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে-আমেরিকার ১৪৩ মিলিয়ন লোক প্রতিদিন কম্পিউটারে কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের ৮৮% লোকেরই সামান্য থেকে বেশি-নানা মাত্রার চোখের উপসর্গ রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম-সারা বিশ্বে একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম-এর উপসর্গসমূহ :

১) মাথা ব্যথা, চোখে ব্যথা

২) জোখ জ্বালাপোড়া করা

৩) চোখের ক্লান্তি রোধ করা

৪) ঝাপসা দেখা বা মাঝে মাঝে ২টি দেখা

৫) ঘাড়ে ও কাঁধে ব্যথা

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম-এর কারণ :

কম্পিউটারের অক্ষরগুলো ছাপার অক্ষরের মতো নয়। ছাপার অক্ষরগুলোর মধ্যভাগ এবং পার্শ্বের ঘনত্ব একই রকম-এগুলো দেখার জন্য সহজেই চোখের ফোকাস করা যায়, অন্যদিকে কম্পিউটারের অক্ষরগুলোর এই ফোকাসের অসমতার জন্য চোখের নিকটে দেখার যে প্রক্রিয়া, একোমোডেশন ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। তাই দীর্ঘক্ষণ যাবৎ কম্পিউটারে কাজ করলে চোখের নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

কম্পিউটারের চশমা :

সাধারণ লেখাপড়ার সময়-১৪১৬ দূরে পড়ার জন্য যে পাওয়ারের চশমা লাগে কম্পিউটারে কাজ করার সময় ১৮-২৮ দূরে মনিটর রেখে সে পাওয়ার দিয়ে ভালো দেখা যায় না। চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ কম্পিউটারে কাজ করার জন্য বিশেষ পাওয়ারের চশমা দিয়ে থাকেন-যার নাম-কম্পিউটার চশমা বা Computer Eye Glass। পয়ত্রিশ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের ইউনিফোকাল বা শুধুমাত্র একটি পাওয়ারের চশমা দিলেই চলে কিন্তু পয়ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের জন্য কোনো কোনো সময় ঐ ইউনিফোকাল চমশা দিয়ে তুলনামূলক নিকটে মনিটরের পাশে রাখা কপি পড়তে অসুবিধা হতে পারে-তাদের জন্য মাল্টি ফোকাল চশমা দিলে কপি পড়া এবং কম্পিউটার মনিটরে কাজ করার সুবিধা হয়।

কম্পিউটারে ভিশন সিনড্রম থেকে মুক্তির উপায়সমূহ :

১) চক্ষু পরীক্ষা : কম্পিউটার ব্যবহারের পূর্বে চক্ষু পরীক্ষা করে, চোখের কোনো পাওয়ার থাকলে অবশ্যই চশমা ব্যবহার করতে হবে। চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কম্পিউটার আই গ্লাস ব্যবহার করতে হবে।

২) সঠিক আলোর ব্যবহার : রুমের ভেতরে বা বাইরে থেকে আসা অতিরিক্ত আলো-চোখের ব্যথার কারণ হতে পারে। বাইরে থেকে আলো চোখে যাতে না লাগে বা কম্পিউটার স্ক্রীনে না পড়ে সে জন্যে পর্দা, ব্লাইন্ড ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। স্বাভাবিক অফিসের আলোর চাইতে কিছুটা কম হলে চোখের জন্য আরামদায়ক।

৩) গ্লেয়ার কমানো : কম্পিউটার মনিটরের অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ক্রীন ব্যবহার করে এবং চশমায় এ অ্যান্টি রিফ্লেকটিভ প্লাস্টিক এর কাচ ব্যবহার করলে গ্লেয়ার কমানো যায়।

৪) কম্পিউটার মনিটরের 'ব্রাউটনেস' বাড়ানো বা কমানো : ঘরের আলোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কম্পিউটার মনিটরের আলো কমানো বা বাড়ানো, যাতে-মনিটরে লেখাগুলি দেখতে আরামদায়ক হয়।

৫) ঘন ঘন চোখের পলক ফেলুন : কম্পিউটারে কাজ করার সময় চোখের পলক পড়া কমে যায়। এর ফলে চোখের পানি কমে যায় ও চক্ষু শুষ্কতা বা ড্রাই আই' হতে পারে। এ অবস্থায় চোখ শুষ্ক মনে হবে। কাটা কাটা লাগবে। চোখের অস্বস্তি ও ক্লান্তি আসবে। কম্পিউটারে কাজের সময়-ঘন ঘন চোখের পলক ফেলুন। এরপরও সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চোখের কৃত্রিম পানি (Artificial Tears) ব্যবহার করুন।

৬) চোখের ব্যায়াম : ৩০ মিনিট কম্পিউটরে কাজ করার পর অন্যদিকে দূরে তাকান। সম্ভব হলে ঘরের বাইরে কোথাও দেখুন এবং আবার নিকটে অন্য কিছু দেখুন। এভাবে চোখের বিভিন্ন ফোকাসিং এর ফলে মাংশপেশির ব্যায়াম হবে। এভাবে কয়েকবার করে আবার কিছুক্ষণ কাজ করুন।

৭) মাঝে মধ্যে কাজের বিরতি দিন : কাজের মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য বিরত দিন। এক ঘণ্টা কম্পিউটারে কাজ করে ৫-১০ মিনিটের বিরতি দিয়ে অন্যকোনো দিকে দেখুন, বা অন্যকোনো কাজে সময় কাটিয়ে আবার কম্পিউটারের কাজ শুরু করতে পারেন। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে ২ ঘণ্টা একটানা কম্পিউটারে কাজ করে ১০-২০ মিনিটের বিরতি দিলেও একই রকম ফল পাওয়া যায়।

৮) কাজের জায়গার কিছু পরিবর্তন : কম্পিউটারে কাজ করার চেয়ারটি হাইড্রলিক হলে ভালো হয়, যাতে কাজের সময় চোখের উচ্চতা কম্পিউটার মনিটরের চাইতে সামান্য উঁচুতে থাকে। মনিটর চোখের বরাবর থাকতে হবে। মনিটর বাকা থাকলে অক্ষরগুলির পরিবর্তন (distortion) হতে পারে যা চোখের ব্যথার কারণ হতে পারে। অনেক সময় টাইপ করার কপিটি এখানে সেখানে রেখে বারবার মনিটর থেকে অনেকখানি দূরে কপি দেখতে হয়। এতেও মাথা ব্যথা ও চোখে ব্যথা হতে পারে। মনিটরের পাশেই পরিমিত আলো ফেলে কপি স্ট্যান্ডে এই লেখাগুলি রাখা যেতে পারে। তাতে বারবার চোখের একোমোডেশন এর পরিবর্তন কম হবে ও কাজ আরামদায়ক হবে।

৯) কাজের ফাকে ফাকে ব্যায়াম : কম্পিউটারে কাজের সময় শুধু চোখের বা মাথার ব্যথা হয় না- অনেকেরই ঘাড়ে ব্যথা, কাধে ব্যথা, কোমরে ব্যথা এসব উপসর্গ হতে পারে। কাজের ফাকে ফাকে যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত পা ও কাঁধের নাড়াচাড়া করা হয় বা ব্যায়াম করা হয় তাহলে উপরের উপসর্গসমূহ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।